POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
30
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

29 জুলাই, 2021 ● 18 যুল হাজ্জাহ 1442 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَوۡ اَنَّ اَہۡلَ الۡکِتٰبِ
اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَکَفَّرۡنَا عَنۡہُمۡ
سَیِّاٰتِہِمۡ وَلَاَدۡخَلۡنٰہُمۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ

এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জান্নাত সমূহে দাখিল করিতাম।

(আল মায়েদা: ৬৬)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাকাত- অভাবগ্রস্তদের অধিকার

১৩৯৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) হযরত মুয়াজ (রা.)কে ইয়েমেন পাঠানো হয় এবং নির্দেশ দেন: তাদেরকে সেই সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান কর যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনড় উপাস্য নেই আর আমি আল্লাহ্‌র রসুল। যদি তারা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের বলে দিও, আল্লাহ্ তা'লা তা'লা তাদের জন্য দিনে ও রাত্রে পাঁচ বার নামায আবশ্যক করেছেন। যদি তারা একথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ তাদের সেই সম্পদের উপর সদকা দেওয়াও বিধিবদ্ধ করেছেন যা তাদের মধ্য থেকে ধনীদের থেকে নিয়ে অভাবীদেরকে মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

যে কাজ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

১৩৯৬) হযরত আবু আইয়ুব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এক ব্যক্তি নবী (সা.) কে বলল: আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।লোকেরা বলে উঠল , 'এর কি হয়েছে?' (অর্থাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি?) আঁ হযরত (সা.) বললেন: অনেক প্রয়োজন আছে। (তোমদের উচিত) আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা,তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা।

(বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ শে জুন,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

রসুলুল্লাহ্ (সা.) 'খাতামান্নাবীঈন তথা নবীগণের মোহর- একথার অর্থ হল, তাঁর মধ্য দিয়ে নবুয়তের সমাপ্ি ঘটেছে। অর্থাৎ সেই সব শ্রেষ্ঠ গুণাবলী যা আদম থেকে মরিয়ম তনয় ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবীদেরকে দেওয়া হয়েছিল-কাউকে কম বা কাউকে বেশি, সেগুলি সব আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার মাঝে পুঞ্জিভূত করা হয়েছে। আর এইরূপে তিনি স্বাভাবিকভাবেই 'খাতামান্নাবীঈন' বা নবীদের মোহর হিসেবে গণ্য হন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর 'খাতামান্নাবীঈন'- এর মর্যাদা

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই নবী দান করেছেন যিনি বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদের মোহর তথা নবীকুলের শিরোমণি। অনুরূপভাবে তাঁর উপর সেই 'কিতাব' অবতীর্ণ করেছেন যা অন্যান্য সকল ঐশী গ্রন্থাবলীর নির্যাস এবং সকল গ্রন্থের মোহর। যখন একথা বলা হয় যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) 'খাতামান্নাবীঈন' তথা নবীগণের মোহর, তাঁর মধ্য দিয়ে নবুয়তের সমাপন হয়েছে, তখন এর অর্থ এই নয় যে নবুয়্যতের এমনভাবে সমাপ্ত হয়েছে, যেভাবে কাউকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করা হয়। (নবুয়তের) এমন সমাপ্তি গর্বের হতে পারে না, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর নবুয়তের সমাপ্তির অর্থ, তাঁর মাধ্যমে নবুয়ত পরম উৎকর্ষে পোঁছেছে। অর্থাৎ সেই সব শ্রেষ্ঠ গুণাবলী যা আদম থেকে মরিয়ম তনয় ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবীদেরকে দেওয়া হয়েছিল-কাউকে কম বা কাউকে বেশি, সেগুলি সব আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার মাঝে পুঞ্জিভূত করা হয়েছে। আর এইরূপে তিনি স্বাভাবিকভাবেই 'খাতামান্নাবীঈন' বা নবীদের মোহর হিসেবে গণ্য হন। অনুরূপভাবে সমস্ত শিক্ষা, পথপ্রদর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন পুস্তকে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি কুরআন শরীফের মাঝে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এইরূপে কুরআন শরীফ 'খাতামুল কুতুব'-এর মর্যাদা লাভ করেছে।

আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে 'খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি।

এ স্থানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত, আমি এবং আমার জামাতের উপর এই অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে 'খাতামান্নাবীঈন' বলে বিশ্বাস করি না। এটি আমাদের উপর এক মহা মিথ্যারোপ। আমরা যে ঈমানী শক্তি, ঐশী জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আঁহযরত (সা.)কে 'খাতামুল আম্বিয়া' বলে মান্য করি এবং বিশ্বাস করি, তার লক্ষ ভাগের একভাগও তারা বিশ্বাস করে না; তাদের এমনটি করার ক্ষমতাও নেই। খাতামুল আম্বিয়া (আ.)-এর 'খাতমে নবুয়ত'-এর তাৎপর্য এবং রহস্য অনুধাবন করতে তারা সম্পূর্ণ অপারগ। তারা কেবল পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু এর তাৎপর্য সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। তারা জানেই না যে খাতমে নবুয়ত কি জিনিস আর এর উপর ঈমান আনার অর্থ কি? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে (যা আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জানেন) আঁ হযরত (সা.)কে খাতামুল আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর 'খাতমে নবুয়ত'-এর সত্যতা এমনভাবে উন্মোচিত করেছেন যে সেই ঐশী জ্ঞানের সুমিষ্ট পানীয়, যা আমাকে পান করানো হয়েছে, তা থেকে এক বিশেষ প্রকারের স্বাদ অনুভব করি, যা সেই ব্যক্তি ভিন্ন কেউ অনুমান করতে পারে না, যে এই প্রস্রবণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছে।

জাগতিকভাবে 'খাতমে নবুয়ত'-এর উপমা চাঁদের ন্যায় যা 'হিলাল' বা চন্দ্ররেখা দিয়ে আরম্ভ হয়ে চৌদ্দ তারিখে পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করে, যাকে পূর্ণিমা বলা হয়। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে নবুয়তের পরাকাষ্ঠা সমাপ্ত হয়েছে। যাদের বিশ্বাস, নবুয়ত জোর করে সমাপ্ত হয়েছে এবং আঁ হযরত (সা.)কে মতি পুত্র ইউনুস (আ.)-এর উপরও প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়, তারা এর তাৎপর্যই অনুধাবন করতে পারে নি; আঁ হযরত (সা.)এর গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্বের কোনও ধারণাই তাদের নেই। বোঝার অপারগতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও তারা দাবি করছে যে আমরা নাকি 'খাতমে নবুয়ত'-এর অস্বীকারকারী। আমি এমন ব্যাধিগ্রস্তদের সম্পর্কে কি বলব এবং তাদের জন্য কিভাবে দুঃখ প্রকাশ করব? যদি তাদের এই অবস্থা না হত আর তারা ইসলামের সত্যতা থেকে একেবারে দূরে সরে না যেত, তবে আমার আগমণের আর প্রয়োজন কি ছিল? তাদের ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তারা ইসলামের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অন্যথায় সত্যবাদীর শত্রুতা করার কোনও কারণই ছিল না, যার পরিণাম মানুষকে কাফেরে পরিণত করে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১১-৩১৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

১৩ জুন, ২০১৪

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

রাশিয়ান অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠান

রাশিয়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন অতিথি এসেছিলেন, যারা আর্মেনিয়া, কিরঘিযিস্তান, আযারবাইজান, জার্জিয়া, চেচেনিয়া এবং উজবেকিস্তান বংশোদ্ভূত। হুযূর আনোয়ার একে একে সকলের সঙ্গে পরিচিত হন।

চেচেনিয়ান বংশোদ্ভূত একটি পরিবারের নেতা এবং তাঁর স্ত্রী সাক্ষাতকালে হুযূর আনোয়ারের কাছে দোয়ার আবেদন করেন। সাক্ষাতের পর তাদের উপর হুযূর আনোয়ারের আধ্যাত্মিকতার গভীর প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। যারপরনায় কৃতজ্ঞতার আবেগ নিয়ে তিনি তাদের মুবাল্লিগ সাহেবকে বার বার বলেন, আপনিও হুযূরকে আমাদের জন্য দোয়ার আবেদন করুন। আমরাও দোয়া করি, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হুযূরের দোয়া গৃহীত হয়। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, আপনি নিজেও হুযূরকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখুন, তিনি নিজে চিঠি পড়েন, দোয়া করেন এবং চিঠির উত্তর দেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে চিঠির উত্তর না দিলেও হবে, কেবল চিঠি পড়ে দোয়া করলেই তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

এক যুবক হুযূর আনোয়ারের সামনেই বসে ছিল। সেই যুবক বলে, হুযূর আনোয়ারের সত্তা থেকে কোন এক আধ্যাত্মিক শক্তি বের হয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছিল। আমি কল্পনাও করি নি যে এমন অতীব উৎকৃষ্ট মানের জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। জলসায় ব্যতীত সময় অত্যন্ত কল্যাণকর ছিল। এই জলসায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের সব চেয়ে সুন্দর এবং এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা যা আমার জীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আযারবাইজান থেকে আসা এক অতিথি জামাতের ভালবাসার বাণী এবং সকল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি তৈরী করার হুযূর আনোয়ারের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জলসা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি ধন্য হয়েছি। অসাধারণ ব্যবস্থাপনা ছিল, নিয়ম-শৃঙ্খলাও ছিল বিশ্বমানের। স্বেচ্ছাসেবীদের ভাবভঙ্গী অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মানুবর্তিতা সকলের মধ্যে এবং সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই জলসার পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সরকারি স্তরের ব্যবস্থাপনার সমতুল্য ছিল। আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আর দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের নিরাপত্তা বিধান করেন।

এক আর্মেনিয়ান ভদ্রমহিলা বলেন: আমি প্রথম বার জলসায় এসেছি। জলসা খুব ভাল লেগেছে। এত মানুষ অথচ কোন ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই সকলে সম্প্রীতি সহকারে একসঙ্গে থাকছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা খুব ভাল ছিল। আমরা বেশ আশ্বস্ত হয়েছি।

একজন অতিথিকে হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? ভদ্রলোক উত্তরে বলেন, 'আমি জন্মগত মুসলমান। আমার পিতা মুসলমান ছিলেন, কিন্তু জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পরই আমি সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়েছি।

হুযূর আনোয়ার বলেন: এখন যদি আপনি প্রকৃত মুসলমান হয়ে থাকেন, তবে আরও গভীরে চিন্তার করে দেখুন যে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। আপনি তাঁকে সন্ধান করুন। জামাতে আহমদীয়া-ই হল হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত। আপনি দোয়া করুন এবং খোদা তা'লার কাছে পথপ্রদর্শন প্রার্থনা করুন।

কিরগিযিস্তান-এর এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে আহমদী এবং অন্যদের মাঝে কি পার্থক্য? এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন-

" আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের নামধারী ব্যক্তিরা ইসলামের শিক্ষাকে ভুলে বসবে, তারা কেবল নামমাত্র মুসলমান থাকবে। মসজিদগুলি বাহ্যত নামাযী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি হবে হিদায়াতশূন্য। কুরআনের অক্ষরগুলি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের উলেমারা আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব হবে। অর্থাৎ সকল মন্দের উৎস তারাই হবে।

সেই সময় একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি সকলকে একত্রিত করবেন, সমস্ত ধর্মের মানুষকে এক হাতে সমবেত করবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণীর প্রসার করবেন এবং মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সূত্রে গেঁথে দিবেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হলেন আর তিনি মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করলেন। ১৮৮৯ সালে জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য মুসলমানদের বিশ্বাস, ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে আসবেন অতঃপর মাহদী (আ.)-এর সঙ্গে মিলে কাজ করবেন। আর আমাদের দাবি হল হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে আসবেন না, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন। আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং হাদীসেও একথাই বর্ণিত আছে। আমাদের বিশ্বাস, যাঁর আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানেরা এখনও তাঁর অপেক্ষায় আছে।

এখন তো ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছে যে যে ঈসা আসার কথা ছিল তিনি আর আসবেন না।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মুসলমানেরা যদি ঈসা (আ.)কে আকাশে জীবিত রাখতে চায় তবে রাখুক। আঁ হযরত (সা.) কে মাটিতে দফন করা হয়েছে আর এরা ঈসা (আ.)কে আকাশে জীবিত রেখে দিয়েছে। এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদাকে অতিরঞ্জিত করতে চায়। আপনি এ বিষয়ে খোদা তা'লার কাছে পথপ্রদর্শন যাচনা করুন। দোয়া করুন এবং খোদা তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করুন। আমি কয়েকজন মহিলার ঘটনা শুনিয়েছিলাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'লা পথপ্রদর্শন করে জানিয়েছেন যে এটিই সেই জামাত যার ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.) করেছিলেন। কাজেই আপনি 'ইহদিনাস সিরাতল মুসতাকিম' দোয়া করতে থাকুন।

প্রধান পার্থক্য হল আমরা আগমণকারী মসীহ (আ.) এর মান্যকারী, অপরদিকে অন্যদের বিশ্বাস, তিনি এখনও আসেন নি।

সিরিয়াতে যে মানুষ নিহত হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন, 'এটি তো আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হবে।

কুরআন করীম শিক্ষা দেয়, মুসলমানকে হত্যা করো না, কলেমাপাঠকারীকে হত্যা করো না। আঁ হযরত (সা.) শান্তির দূত হয়ে এসেছিলেন। এরা তো কলেমা পাঠকারী , অথচ একে অপরকে হত্যা করছে। পাকিস্তান, সিরিয়া,ইরাক, মিশর এবং কিছু অন্যান্য মুসলমান দেশে এই সবই হচ্ছে। এগুলিই বলে দিচ্ছে যে যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন। তাঁর কথা শোনো এবং তাঁকে গ্রহণ করো।

হুযূর আনোয়ার বলেন- আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এই বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, 'রুহমাও বায়নাহুম'। অর্থাৎ, তারা পরস্পরের প্রতি কোমল। এগুলি কি দয়া বা কোমলতার নিদর্শন? এরা উল্টো অত্যাচারের এমন এক ইতিহাস রচনা করছে যে শয়তান পর্যন্ত এদের অত্যাচার দেখে শিউরে উঠবে।

তাই এই সব কিছু দেখে চিন্তা করা দরকার যে এমনটি কেন হচ্ছে? এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে খোদার কাছে পথপ্রদর্শন প্রার্থনা করুন। এবং নিজের ইহকাল এবং পরকাল সুসজ্জিত করুন। আপনি এখানে জলসায় এসে নিজের চোখে সব কিছু দেখেছেন।

অতিথিগণ হুযূর আনোয়ারের নিকট শান্তির উদ্দেশ্যে দোয়ার আবেদন জানালে তিনি বলেন-

আমিও দোয়া করি এবং চেষ্টাও করি। আজি আমি নিজের ভাষণে বলেছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন। বর্তমানে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে এই কাজ অব্যাহত আছে। আজ আমি সেই সব লোকদের একথাই বলেছি যে যে শান্তির দিকে আসুন, এতে তোমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

আরব অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

আরব অতিথির সংখ্যা ছিল ২২০জন যাদের মধ্যে জার্মানী থেকে ১৪০জন এবং বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন এবং অন্য কয়েকটি দেশ থেকে আরও ৮০জন অতিথি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইরাকি বংশোদ্ভূত এক আরব বলেন-জলসা আমার খুব ভাল লেগেছে। ধর্মের দিক থেকে আমি একজন খৃষ্টান আর এই প্রথম জলসায় অংশগ্রহণ করছি। সমস্ত কাজ সুসংগঠিত ছিল।

হুযূর আনোয়ার সিরিয়া প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন- আপনাদের নেতারা বুঝতে পারছেন না, আর তারা বুঝতেও চান না। আমরা তাদেরকে নিরন্তর বুঝিয়ে চলেছি। মোল্লারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতিকে বিবেক দান করুন-আমাদের সকলের এই দোয়া করা উচিত।

মুসলমানদের সব থেকে বড় দুর্ভাগ্য হল তারা নিজেদের মধ্যে দয়াসুলভ আচরণ করার পরিবর্তে, পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত থাকে, 'রুহমাউ বাইনাহুম'- কুরআন করীমের এই নির্দেশ ভুলে বসেছে।

মুসলমানদের এই অত্যাচারপূর্ণ আচরণের কারণে ইসলামের সুনাম হানি হচ্ছে, এরা পশ্চিমা দেশগুলিতে ইসলামের উপর কলঙ্ক লেপন করছে। এই সব কিছু কি মুসলমানদেরকে চিন্তা করতে বাধ্য

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্‌র কসম! হযরত উমর যা কিছু বলেছেন তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। কঠোরতা করার সময় কঠোরতা এবং কোমলতার সময় কোমলতার বিষয়ে অনেকে এগিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি লোকেরে সন্তানের পিতার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হযরত ওমরের কথা চিন্তা কর। একদিকে তাঁর প্রতাপ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে পৃথিবীর বড় বড় বাদশাহরা কাঁপত, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও প্রকম্পিত হতো। কিন্তু অন্যদিকে অন্ধকার রাতে এক বেদু ইন মহিলার সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমর (রা.)-এর ন্যায় মহান মর্যাদার মানুষও অস্থির হয়ে যান এবং আটার বস্তা নিজের পিঠে এবং ঘিয়ের কৌটা নিজ হাতে নিয়ে তার কাছে যান আর ততক্ষণ ফিরে আসেন নি যতক্ষণ না তিনি নিজ হাতে খাবার রান্না করে সেসব শিশুকে খাইয়েছেন এবং তারা শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

[আল মুসলেহ মওউদ (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। ”

চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হয় ও জানাযা গায়েব পড়ানো হয়, তারা হলেন- মাননীয় আব্দুল ওয়াহীদ ওয়াড়াইচ (সদর জামাত ওয়াল্ডশাট, জার্মানী), হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রদৌহিত্রী মাননীয়া আমাতুন নুর সাহেবা (ওয়াশিংটন), মাননীয়া বিসমিল্লাহ্ বেগম সাহেবা (বিশেষ নিরাপত্তাকর্মী মাননীয় নাসের আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিণী), এবং মাননীয় কর্ণেল জাভেদ রুশদী সাহেব (রাওয়ালপিণ্ডি)।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৫ জুন, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৫ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আজ আরো কিছু বলব। যায়েদ বিন আসলাম রেওয়ায়েত করেন যে, তার পিতা বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সাথে 'হাররাহ্ ওয়াকিম' অভিমুখে যাই। এটি দুই হার্‌রার মাঝে (অবস্থিত) একটি জায়গা। কালো পাথুরে জমিকে 'হার্‌রাহ্' বলা হয়। মদিনার পূর্বদিকে 'হার্‌রাহ্ ওয়াকিম'অবস্থিত, যাকে হার্‌রাহ্ বনু কুরাইযাহ্ও বলা হয়। অপরটি হলো, 'হার্‌রাতু ল ওয়াবরা'যা মদিনার পশ্চিমে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, তিনি বলেন আমরা যখন 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছি তখন এক জায়গায় আগুন জ্বলছিল। 'সিরার'ও মদিনা হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আসলাম! আমার মনে হয় এরা কোন মুসাফির হবে যাদেরকে রাত ও শীত (এখানে) থামতে বাধ্য করেছে। আমার সাথে চল। অতএব আমরা দ্রুত হেঁটে তাদের কাছে পৌঁছি আর দেখি, একজন মহিলার সাথে তার কয়েকজন সন্তান রয়েছে আর একটি হাঁড়ি উনুনের ওপর রাখা আছে। তার সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় ডুকরে কাঁদছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আলোকোজ্জ্বলকারীরা! আস্ সালামু আলাইকুম। তিনি আগুন ওয়ালা বলা পছন্দ করেন নি, বরং আলোকোজ্জ্বলকারী (বলেছেন)। সেই মহিলা ওয়া আলাইকুম আস্ সালাম বলে। তিনি (রা.) বলেন, আমি (তোমাদের) নিকটে আসতে পারি কি? সেই মহিলা বলেন, সৎ উদ্দেশ্য থাকলে আস, নতুবা ফিরে যাও। অর্থাৎ কোন ভালো কথা বলতে চাইলে আস, নতুবা ফিরে যাও। তিনি (রা.) কাছে যান, এরপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কী হয়েছে? উত্তরে সেই মহিলা বলে, রাত এবং শীত আমাদেরকে এখানে আটকে রেখেছে। তিনি (রা.) বলেন, এই শিশুদের কী হয়েছে, এরা কেন ডুকরে কাঁদছে? সেই মহিলা বলেন, ক্ষুধার তাড়নায়। হযরত উমর (রা.) বলেন, এই হাঁড়িতে কী আছে? সেই মহিলা বলে, এতে শুধু পানি আছে আর এর মাধ্যমে আমি বাচ্চাদের প্রবোধ দিচ্ছি, যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আল্লাহ্ আমাদের এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে মীমাংসা করবেন। তিনি (রা.) বলেন, হে মহিলা! আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, তোমাদের অবস্থা উমর কি করে জানবেন? সে বলে, তিনি আমাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ব্যাপারে উদাসীন। হযরত উমর (রা.)'র সঙ্গী আসলাম বলেন, এরপর তিনি (রা.) আমার কাছে ফিরে আসেন আর বলেন, আমার সাথে চল। তারপর আমরা অত্যন্ত দ্রুত হেটে 'দারুল দাকীক' পৌঁছি। হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে 'দারুল দাকীক' নামে একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন। যাতে আটা, ছাতু, খেজুর, কিশমিশ এবং সফরের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, যা একজন মুসাফিরের প্রয়োজন হতে পারে, তা রাখা থাকত। তিনি (রা.) মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী পথেও মুসাফিরদের জন্য কয়েকটি সরাইখানা বানিয়ে রেখেছিলেন। যাহোক এরপর তিনি (রা.) সেখান থেকে এক বস্তা খাদ্যশস্য বের করেন এবং একটি ঘিয়ের কৌটা নেন। তিনি (রা.) বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। আসলাম বলেন, আপনার পরিবর্তে আমি বহন করছি। হযরত উমর (রা.) দুই অথবা তিনবার বলেন, এগুলো আমার (পিঠে) তুলে দাও। প্রতিবারই আমি নিবেদন করি, আপনার স্থলে আমি বহন করছি। অবশেষে হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার মঙ্গল হোক। কিয়ামত দিবসে আমার বোঝা কি তুমি বহন করবে? এরপর আমি সেই বস্তা তাঁর (পিঠে) তুলে দিই। এরপর তিনি (রা.) সেই বস্তা নিজের পিঠে উঠিয়ে দ্রুতগতিত হাঁটতে আরম্ভ করেন আর আমিও তাঁর সাথে দ্রুত চলতে থাকি এবং অবশেষে সেই মহিলার কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (রা.) সেই বস্তাটি তার কাছে নামিয়ে তা থেকে কিছু আটা বের করেন এবং সেই মহিলাকে বলেন, এগুলো তুমি অল্প অল্প করে হাঁড়িতে ঢাল আর আমি তোমার জন্য নাড়ছি। অন্যত্র লিখা আছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি ধীরে ধীরে আটা ঢাল, আমি তোমার জন্য হারীরা রান্না করে দিচ্ছি। এরপর তিনি (রা.) হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বালানোর জন্য ফুঁ দিতে থাকেন। আসলাম, অর্থাৎ রেওয়ায়েতকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) দীর্ঘ ও ঘন শ্মশ্রূধারী ছিলেন। আমি দেখি, ধোঁয়া তাঁর দাড়ির মধ্যে দিয়ে বের হচ্ছে। অর্থাৎ ধোঁয়া উঠার সময় তাঁর চেহারাতেও লাগত আর দাড়ির মধ্যেও ঢুকে যেত। রান্না শেষ হলে তিনি (রা.) হাঁড়িটি নীচে নামিয়ে রাখেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, কোন পাত্র নিয়ে আসুন। সেই মহিলা বড় একটি প্লেট নিয়ে আসে। তিনি (রা.) তাতে খাবার ঢেলে দিয়ে বলেন, তুমি এই শিশুদের খাওয়াও আর আমি তোমার জন্য (খাবার ঢেলে) ছড়িয়ে রাখছি যাতে ঠাণ্ডা হয়। অর্থাৎ আরেকটি পাত্রে আরো (খাবার) ঢেলে তা ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করছি। তিনি (রা.) অনবরত (খাবার) ঢেলে ঠাণ্ডা করতে থাকেন যতক্ষণ না বাচ্চারা পেট ভরে খাবার খেয়ে নেয়। অবশিষ্ট খাবার তিনি তার কাছেই রেখে আসেন। আসলাম বলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যান আর আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যাই। তখন সেই মহিলা বলে, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এক্ষেত্রে, অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আমীরুল মু'মিনীনের চেয়ে অধিক হকদার। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, পুণ্যের কথা বল। তুমি যখন আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাবে তখন তুমি আমাকে সেখানে পাবে, ইনশাআল্লাহ্। যাহোক, তিনি বলেন, এরপর হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে এক দিকে সরে গিয়ে সেই মহিলার দিকে মুখ করে বসে পড়েন। আমি তাঁর সমীপে নিবেদন করি, এছাড়াও আরো কোন কাজ আছে কি? তিনি (রা.) আমাকে এর কোন উত্তর দেন নি। এক পর্যায়ে আমি যখন দেখি, বাচ্চারা পরস্পরের সাথে খেলাধুলা করছে, হাসাহাসি করছে এবং সব শিশু শান্তিতে ঘুমিয়ে গেছে তখন হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দাঁড়ান এবং আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে আসলাম! এই শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় জেগে ছিল এবং কাঁদছিল। আমি চাইলাম যে, এখান থেকে আমি ততক্ষণ যাব না যতক্ষণ না আমি তাদের এই স্বস্তির অবস্থা দেখতে পাই যা আমি এখন দেখেছি।

(তারিখুত তাবারী লি ইবনে হারীর, ২য় খণ্ড,পৃ: ৫৬৭-৫৬৮) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০১,১০২,১৭২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) লিখেন,যারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম এমন লোকদের জন্য তা সরবরাহ করা ইসলামী রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য; অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর একটি ঘটনা (হৃদয়ে) গভীর রেখাপাতকারী ও বাস্তবতা উন্মোচনকারী। একবার দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) বাইরে বের হন এটি জানার জন্য যে, কোন মুসলমানের কোন কষ্ট নেই তো? রাজধানী মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরত্বে মিরার নামক একটি গ্রাম ছিল। আমাদের গবেষকরা বলছেন, সম্ভবত এর নাম মিরার নয়, বরং সিরার। হতে পারে লিপিকারের ভুলের জন্য মিরার লিখা হয়েছে। যাহোক, সেখানে তিনি দেখেন, এক দিক থেকে কান্নার রোল ভেসে আসছে। সেদিকে গিয়ে দেখেন, এক মহিলা কিছু রান্না করছে আর ২-৩টি শিশু কান্না করছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী সমস্যা? সেই (মহিলা) বলে, ২-৩ বেলা শিশুরা অনাহারে আছে, কিন্তু ঘরে খাওয়ার কিছু নেই। বাচ্চারা খুবই অস্থির হয়ে গেছে, তাই খালি হাঁড়িই উনুনে চড়িয়ে দিয়েছি যাতে তারা প্রবোধ পেয়ে ঘুমিয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) একথা শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে মদিনায় ফিরে আসেন আর এরপর আটা, ঘি, মাংস ও খেজুর একটি বস্তায় উঠিয়ে তাঁর সেবককে বলেন, এটি আমার পিঠে তুলে দাও। সে বলে, হুযুর! আমি তো আছি, আমি নিজেই উঠিয়ে নিচ্ছি। উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এখন তুমি এটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমার বোঝা কে উঠাবে? অর্থাৎ তাদের পানাহারের খোঁজখবর রাখা আমার দায়িত্ব ছিল, আর এ দায়িত্ব পালনে আমার ত্রুটি হয়েছে তাই এর প্রায়শ্চিত্ত হলো আমি নিজে বহন করে এ সমস্ত উপকরণ নিয়ে যাব এবং তাদের ঘরে পৌঁছে দিব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, অভাবীদের যে ভাতা দেওয়া হয়- এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এ অর্থ না করে যে, আলস্য সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক অভাবীকে ভাতা দিতে হবে। তিনি(রা.) লিখেন, ইসলাম যেখানে দরিদ্রদের দেখাশোনার নির্দেশ দেয়, সেখানে যেমনটি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, অলসতা ও উদাসীনতাকেও দূর করে। ভাতা এ কারণে দেওয়া হয় না যে, আলস্য এবং উদাসীনতা সৃষ্টি করা হবে। এই ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, মানুষ কাজ ছেড়ে বসে থাকবে। বরং এই ভাতা কেবল অপারগদের দেওয়া হতো। অন্যথায় হাত পাতা থেকে মানুষকে বিরত করা হতো। হযরত উমর (রা.) ভিক্ষুকদের হাত পাতা থেকে বিরত রাখার জন্যও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এটি নয় যে, ভিক্ষুক দেখলেই খাবার খাইয়ে দিতেন বা কেউ সাহায্য চাইলেই কিছু দিয়ে দিতেন, বরং ভিক্ষুক স্বাস্থ্যবান হলে তিনি (রা.) অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। একবার হযরত উমর (রা.) এক ভিক্ষুককে দেখেন যে, তার থলে আটায় পূর্ণ ছিল। সে ভিক্ষা করছিল আর তার থলেতে আটা ভর্তি ছিল। তিনি (রা.) তার কাছ থেকে আটা নিয়ে উটের সামনে দিয়ে দেন আর থলি খালি করে দিয়ে বলেন, এখন ভিক্ষা কর। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, ভিক্ষুকদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো।

(আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকি ইসলাম, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭)

অর্থাৎ তুমি সুস্থ সবল মানুষ,তুমি ভিক্ষা করছ কেন? পরিশ্রম কর, উপার্জন কর আর খাও। এছাড়া এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুনরায় ভিক্ষা করলে তোমার সাথে আবারও একই ব্যবহার করা হবে, অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশুপাখিকে দিয়ে দেওয়া হবে। যারা হাত পাতে তাদের অধিকাংশ এই একটি উদাহরণ দিয়েই এ বিষয়ের ওপর জোর দেয় যে, দেখ! হযরত উমর (রা.) কীভাবে দেখাশোনা করতেন? কিন্তু ইসলাম যে হাত পাততে বারণ করেছে তা দেখে না। এছাড়া এ বিষয়েও হযরত উমর (রা.)-এর এবং মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে আর হযরত উমর (রা.) যে তা বাস্তবায়ন করেছেন তারা সেটি দেখে না।

পুনরায় এ ঘটনাটি অন্যত্র বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত ওমরের কথা চিন্তা কর। একদিকে তাঁর প্রতাপ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে পৃথিবীর বড় বড় বাদশাহরা কাঁপত, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যও প্রকম্পিত হতো। কিন্তু অন্যদিকে অন্ধকার রাতে এক বেদুইন মহিলার সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখে উমর (রা.)-এর ন্যায় মহান মর্যাদার মানুষও অস্থির হয়ে যান এবং আটার বস্তা নিজের পিঠে এবং ঘিয়ের কৌটা নিজ হাতে নিয়ে তার কাছে যান আর ততক্ষণ ফিরে আসেন নি যতক্ষণ না তিনি নিজ হাতে খাবার রান্না করে সেসব শিশুকে খাইয়েছেন এবং তারা শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৯৬)

পুনরায় হযরত উমর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস, যার উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে, সেই আসলাম বলেন, মদিনায় একটি বানিজ্য কাফেলা আসে। তারা ঈদগাহে অবস্থান নেয়। হযরত উমর (রা.) আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে বলেন, আমরা রাতের বেলা তাদেরকে পাহারা দিব- এটি কি আপনি পছন্দ করবেন? তিনি নিবেদন করেন, জ্বী হ্যাঁ। সুতরাং তারা দুজন সারারাত তাদের প্রহরা দিতে থাকেন এবং ইবাদত করতে থাকেন। হযরত উমর (রা.)এক শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে সেখানে যান এবং তার মাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ভয় কর এবং নিজ সন্তানদের ভালোভাবে দেখাশোনা কর। এটি বলে তিনি ফিরে আসেন। তিনি পুনরায় তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। অর্থাৎ যেখানে তিনি জিনিসপত্রের প্রহরার জন্য বসেছিলেন সেখানে ফিরে এসে পুনরায় তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি আবার তার মায়ের কাছে যান এবং পুনরায় তাকে পূর্বের ন্যায় বলেন আর নিজ স্থানে ফিরে আসেন। রাতের শেষ প্রহরে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি (রা.) তার মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি অনেক উদাসীন মা। ব্যাপার কী যে, সারারাত তোমার শিশু অস্থির হয়ে কাঁদছে? সে অর্থাৎ সেই মহিলা বলে, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমি তাকে দুধের পরিবর্তে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে, অর্থাৎ সেই শিশু অস্বীকার করছে আর দুধই খেতে চাইছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কেন? সেই মহিলা বলে, কেননা হযরত উমর (রা.) সেসব শিশুর জন্যই ভাতা নির্ধারণ করেছেন যাদের দুধ ছাড়ানো হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই সন্তানের বয়স কত? সেই মহিলা বলে, এত আর এত মাস। হযরত উমর বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়া করো না। এরপর বাজামা'ত ফজরের নামায পড়ানোর সময় তার কান্নার কারণে মানুষের জন্য কেরাত স্পষ্ট হচ্ছিল না। হযরত উমর নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, উমরের মন্দ হোক, সে কত মুসলমানের সন্তানকে-ই না হত্যা করে থাকবে। এরপর তিনি ঘোষককে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করে যে, তোমাদের সন্তানদের দুধ ছাড়ানোর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করো না, আমরা ইসলামে বা মুসলমান ঘরে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক শিশুর জন্য ভাতা নির্ধারণ করছি আর হযরত উমর সকল দেশে এই নির্দেশ জারী করেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াতু, লি ইবনে কাসীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮৫-১৮৬)

এই ঘটনাটিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমর প্রথম দিকে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য কোন ভাতা নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে নির্দেশ দেন যেন তাদের অংশ তাদের মায়েদের দেওয়া হয়। পূর্বে হযরত উমর এটি মনে করতেন যে, যতদিন শিশু দুধ পান করে সে জাতীয় স্বার্থে ভূমিকা পালন করে না। তার দায়িত্ব তার মায়ের ওপর থাকে, জনগণের ওপর নয় যে, বায়তুল মাল থেকে তার খরচ প্রদান করা হবে। কিন্তু একবার হযরত উমর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাইরে যান। শহরের বাইরে বেদুইনদের একটি কাফেলা তাঁবু খাটিয়ে ছিল। হযরত উমর একটি তাঁবু থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। শিশুটি চিৎকার করছিল আর মা হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলানো সত্ত্বেও যখন শিশুটি চুপ করে নি তখন মা শিশুটিকে চপেটাঘাত করে বলে, উমরকে অভিশাপ দাও। হযরত উমর আশ্চর্য হন যে, এর সাথে আমার কী সম্পর্ক! হযরত উমর সেই মহিলার কাছে তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করেন আর ভিতরে প্রবেশ করে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন যে,হে ভদ্র মহিলা! কী হয়েছে? সে যেহেতু হযরত উমরকে চিনত না তাই সে বলে, কী হয়েছে যে, হযরত উমর সবার ভাতা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি কি এটি জানেন না যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরও খাবারের প্রয়োজন হয়। আমার দুধ তার জন্য যথেষ্ট নয় আর আমি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি, যেন তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। হযরত উমর তখনই ফিরে আসেন এবং কোষাগার থেকে আটার বস্তা বের করান আর স্বয়ং তা কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকেন। যে ব্যক্তি কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সে এগিয়ে আসে যে, আমরা তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। হযরত উমর তাকে বলেন, তুমি ছেড়ে দাও, আমি নিজেই এটি বহন করে নিয়ে যাব। কিয়ামতের দিন আমাকে যখন চাবুকাঘাত করা হবে তখন কি আমার স্থলে তুমি উত্তর দিবে। জানি না এভাবে আমার মাধ্যমে কত শিশু মারা গেছে। এরপর হযরত উমর দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ জারি করেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৭ ,পৃ: ৩৫৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হাদীসে আস্মার বিন খুযায়মা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর আমার পিতাকে বলেন, তোমাকে কীসে নিজ জমিতে বৃক্ষ রোপনে বারণ করেছে? তখন আমার পিতা বলেন, (সেই ব্যক্তি আর বৃক্ষ রোপন করছিল না, নিজের বাগানকে সম্প্রসারিত করছিল না অথবা নষ্ট চারার স্থলে নতুন গাছ লাগাচ্ছিল না) আমার পিতা উত্তর দেন যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। কিছু দিনের মাঝেই মৃত্যু বরণ করব। এতে আমার কী লাভ? অতএব হযরত উমর তাকে বলেন, তোমাকে গাছ লাগাতেই হবে, (এক্ষেত্রে) কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ তোমাকে আবশ্যিকভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। তিনি বলেন, এরপর আমি হযরত উমরকে দেখেছি যে, তিনি স্বয়ং আমার পিতার সাথে আমাদের জমিতে বৃক্ষ রোপন করতেন।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটি অলসতা বর্জনের প্রেক্ষিতেও বর্ণনা

করেছেন আর এ কথা বুঝিয়েছেন যে, পূর্বপুরুষের লাগানো গাছের ফল তোমরা ভোগ করছ, তাই পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও কিছু রেখে যাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) রাতের বেলা পায়চারি করতেন। এক রাতে শহরে ঘোরাফেরার সময় তিনি এক মহিলাকে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনতে পান। তিনি (রা.) দিনের বেলা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্বামী দীর্ঘদিন যাবৎ বাইরে আছে। সে সেনাবাহিনীর সাথে বাইরে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি (রা.) এই আদেশ জারি করেন যে, কোন সৈনিক যেন চার মাসের বেশি বাইরে না থাকে। যদি কোন সৈনিকের এর চেয়ে বেশি সময় বাইরে থাকতে হয় তবে সে যেন তার স্ত্রীকেও সাথে রাখে। অন্যথায় তাকে যেন সেনাকর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে বাড়িতে ফেরত পাঠায়। ”

(খুতবাতে মাহমুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৩, ১৯১৪ সন)

এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় এক স্থানে এটিও বলা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) সেই মহিলার কবিতা আবৃত্তি শুনে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কোন পাপের সংকল্প কর নি তো? সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমি আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাচ্ছি। হযরত উমর (রা.) সেই মহিলাকে বলেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার স্বামীর নিকট আমি আজকেই পত্র প্রেরণ করছি। অতএব তিনি (রা.) তার স্বামীকে ফেরত আনতে একজন দূত প্রেরণ করেন। এরপর তিনি (রা.) এই বিষয়ে আরও খোঁজখবর নেন। আর যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) সর্বোচ্চ চার মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন, অর্থাৎ এই সময়ের বেশি যেন স্বামী বাইরে না থাকে, অন্যথায় স্ত্রী-সন্তানরা যেন সাথে থাকে।

(তারিখুল খুলাফা, পৃ: ১১১)

হযরত উমর (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আসলাম বলেন, একবার আমি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মদিনার বাইরের অংশে গেলে সেখানে একটি তাঁবু দেখতে পাই। আমরা সেই তাঁবুর নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা দেখি তাঁবুতে এক ভদ্র মহিলা প্রসব বেদনায় কাঁদছে। হযরত উমর (রা.) তার খবরাখবর জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি একজন ভিনদেশি মুসাফির আর আমার কাছে কিছুই নেই। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) কেঁদে ফেলেন এবং দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি কি সেই পুণ্য অর্জন করতে চাও যার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন? তখন তিনি (রা.) তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বলেন, জ্বী, অবশ্যই। অতঃপর হযরত উমর (রা.) নিজের পিঠে আটা ও ঘি উঠান এবং হযরত উম্মে কুলসুম প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তারা উভয়ে সেখানে আসেন। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) সেই মহিলার নিকট যান এবং হযরত উমর (রা.) সেই মহিলার স্বামীর কাছে গিয়ে বসে পড়েন। তার স্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তাঁকে চিনত না। তিনি (রা.) তার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকেন। সেই মহিলা একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সঙ্গীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন। অর্থাৎ সেই মহিলার স্বামীকে এই সুসংবাদ দিন যে, পুত্র সন্তান হয়েছে। সেই ব্যক্তি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর এই কথা শুনে বুঝতে পারে যে, সে কত মহান ব্যক্তির সাথে বসে ছিল, কেননা সে জানত না যে, কার সাথে বসে আছে! অতঃপর সে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি (রা.) বলেন, কোন সমস্যা নেই। এরপর তিনি (রা.) তাদেরকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন আর ফিরে আসেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াতু, লি ইবনে কাসীর, ১০ম খণ্ড, পৃ:-১৮৬)

সাঈদ বিন মুসাইয়েব এবং হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর কসম! হযরত উমর (রা.) যা কিছু বলেছেন তা রক্ষা করেছেন। কঠোরতার স্থানে কঠোরতায় ও নম্রতার স্থানে নম্রতায় তিনি এগিয়ে যান এবং মানুষের সন্তানসন্ততির পিতা হয়ে যান। এমনকি তিনি সেসব মহিলাদের কাছে যেতেন যাদের স্বামীরা বাহিরে অবস্থান করত। তাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে তাদেরকে সালাম দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? বা তোমরা প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্র আনাতে চাইলে আমি তা বাজার থেকে তোমাদেরকে কিনে এনে দিচ্ছি। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হবে- এটি আমি অপছন্দ করি। তখন সেসব মহিলা তাঁর সাথে তাদের ছেলে-মেয়েদের (বাজারে) পাঠিয়ে দিত। তিনি (রা.) যখন বাজারে যেতেন তখন তাঁর সাথে মানুষের ছেলে-মেয়েরা এত বেশি সংখ্যায় থাকত যে, তাদেরকে গণনা করাই কঠিন হয়ে যেত। এরপর (বাজারে গিয়ে) তিনি প্রত্যেকের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতেন আর যেসব মহিলার কোন সন্তান ছিল না, তাদের জন্য তিনি নিজেই বাজার করে আনতেন। যখন কোন অভিযানে প্রেরিত সৈন্যদল থেকে কোন দূত (বার্তাবাহক) আসত তখন তিনি তার কাছ থেকে সেই মহিলাদের স্বামীদের প্রেরিত চিঠিপত্র নিয়ে স্বয়ং তাদের নিকট পৌঁছে দিতেন আর তাদেরকে বলতেন, তোমাদের স্বামী আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় গিয়েছে আর তোমরা রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর শহরে বসবাস করছ। এই পত্র পড়ার মতো কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে ভালো কথা, নতুবা দরজার কাছে এসে দাঁড়াও, আমি নিজেই পড়ে শুনাচ্ছি। এরপর বলতেন আমাদের দূত (বার্তাবাহক) এখান থেকে অমুক অমুক দিন যাবে, তোমরা চিঠি লিখে দিও যেন আমি তোমাদের চিঠি পত্র পাঠিয়ে দিতে পারি। এরপর তিনি (রা.) সেই মহিলাদের কাছে চিঠি লেখার কাগজ ও দোয়াত ইত্যাদি নিয়ে যেতেন এবং তাদের মধ্যে যারা চিঠি লিখে দিত তাদের চিঠি নিতেন আর যারা চিঠি লিখতে পারত না তাদেরকে বলতেন, এই হচ্ছে কাগজ ও দোয়াত, দরজার কাছে আস আর আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নাও। এভাবে তিনি (রা.) এক একটি বাড়ির দরজায় যেতেন আর তাদের পক্ষ থেকে তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে দিতেন এবং সেগুলোকে তাদের স্বামীদের কাছে প্রেরণ করতেন।

(ইযালাতুল খিলাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, প্রণেতা শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলভী (অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৮-২২৯)

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি দেখলাম হযরত উমর (রা.) উটের গদি কাঁধে নিয়ে 'আবতা'-র দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। এই 'আবতা' মক্কা ও মিনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। হযরত আলী বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তখন তিনি (রা.) বলেন, সদকার একটি উট হারিয়ে গেছে, আমি তার সন্ধানে যাচ্ছি। আমি হযরত উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম, আপনি আপনার পরে আগমনকারী খলীফাগণের জন্য এমন পথ নির্ধারণ করেছেন, এমন সব বিষয় সম্পাদন করছেন, যার উপর চলা সহজ কাজ নয়। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আবুল হাসান! আমাকে তিরস্কার করো না। মুহাম্মদ (সা.)-কে যিনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় (সদকার) একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় তাহলে কিয়ামত দিবসে উমর সেই ছাগলছানার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

(ইযালাতুল খিলাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, প্রণেতা শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলভী (অনুবাদ), ৩য় খণ্ড, পৃ:২৮৬-২৮৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একবার একজন মুসলমান মাথা নীচু করে হেঁটে আসছিল। অর্থাৎ এক মুসলমান ব্যক্তি মাথা নীচু করে হাঁটছিল। হয়ত সে কোন কষ্ট বা কোন আঘাত পেয়েছিল যার কারণে সে উদ্বিগ্ন ছিল আর তাই মাথা নীচু করে হেঁটে আসছিল। হযরত উমর (রা.) তার চিবুকে একটি ঘুষি মারেন এবং বলেন, এখন ইসলামের বিজয়ের যুগ আর তুমি তোমার মাথা নীচু করে হাঁটছ! অর্থাৎ এখন সেই যুগ যখন ইসলামের বিজয় হচ্ছে, তোমার যদি সামান্য কষ্টও হয়ে থাকে তার জন্য তুমি নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলেছ আর মাথা নীচু করে হাঁটছ, এটি সঙ্গত কোন রীতি নয়। খোদা তা'লা এই যুগে ইসলামকে রাজত্ব দান করেছেন; জগত যা-ই বলুক, কিন্তু তুমি তো এই বিশ্বাস রাখ যে, ইসলামের বিজয় হবে। যদি তুমি এই বিশ্বাস রাখ যে, ইসলাম বিজয় লাভ করবে তাহলে কাঁদার তো কোন যুক্তি নেই?

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ৩৭৯)

ছোট ছোট বিষয়ে ক্রন্দন করার কোন প্রয়োজন নেই। কোন জায়গায় যদি মুসলমানদের ক্ষতিও হয় তাতেও ক্রন্দন করার ও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। এই কথাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরতের প্রেক্ষাপটে বলেছিলেন। তিনি (রা.) আরো বলেছিলেন, এক মু'মিনের এটি দেখা উচিত নয় যে, সে কী হারিয়েছে। যদি কোন জিনিস নষ্টও হয়ে গিয়ে থাকে, কিছুটা ক্ষতিও যদি হয়ে থাকে তবুও এটি দেখা উচিত নয় যে, কী হারিয়েছে, বরং এটি দেখা উচিত যে, কার জন্য হারিয়েছে। যদি খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, হস্তচ্যুত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আরো উত্তম প্রতিদান দিবেন। সাময়িক ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত হতে হয় না।

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, যদিও হযরত উমর (রা.)-কে কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি (রা.) সেই কষ্টের কোন পরোয়া করেন নি এবং তিনি (রা.) সেই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যা ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই ঘটনা হলো, জাবালা ইবনে আয়হাম খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী এক বড় গোত্রের নেতা ছিল। সিরিয়ার দিকে মুসলমানরা যখন অগ্রাভিযান শুরু করে, তখন সে নিজ গোত্রসহ মুসলমান হয়ে যায় এবং হজ্জের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। হজ্জের এক জায়গায় অনেক ভিড় ছিল। ঘটনাক্রমে কোন মুসলমানের পা তার পায়ে গিয়ে

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

পড়ে। কতিপয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, দৈবক্রমে সেই দরিদ্র মুসলমানের পা তার জুব্বার কিনারায় পড়ে। যেহেতু সে নিজেকে একজন বাদশাহ মনে করত এবং তার ধারণা ছিল যে, আমার জাতির ষাট হাজার ব্যক্তি আমার আদেশের অনুবর্তী, বরং কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে কেবল তার সৈন্য সংখ্যাই ছিল ষাট হাজার। যাহোক, যখন এক দরিদ্র মুসলমানের পা তার পায়ের ওপর পড়ে তখন সে ক্রোধবশত তাকে চড় মারে এবং বলে, তুই আমার অসম্মান করলি, তুই কি জানিস না আমি কে!শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তোর পেছনে সরে যাওয়া উচিত ছিল। তুই বেয়াদবি করে আমার পায়ে পা রেখেছিস। সেই হতদরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি চড় খেয়ে নীরব থাকে, কিন্তু অন্য এক মুসলিম ব্যক্তি বলে উঠে, তুমি কি জান! যে ধর্মে তুমি প্রবেশ করেছ সেই ধর্মের নাম ইসলাম। আর ইসলাম ধর্মে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। বিশেষত এই গৃহে অর্থাৎ খানা কা'বায়, যেটির তুমি তাওয়াফ করছ, এখানে ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ করা হয় না। সে বলল, আমি এসবের পরোয়া করি না। সেই মুসলমান বলেন, উমরের কাছে তোমার বিষয়ে নালিশ করা হলে তিনি উক্ত মুসলমানের সাথে কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবেন। জাবালা ইবনে আয়হাম এ কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং বলে, জাবালা বিন আয়হামের মুখে চড় মারার মতো কেউ কি আছে? সেই মুসলিম ব্যক্তি বলেন, অন্যদের কথা তো আমার জানা নেই তবে উমর (রা.) নিশ্চিতরূপে এরূপই। এ কথা শুনে সে দ্রুত তাওয়াফ শেষ করে এবং সোজা হযরত উমর (রা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয় আর তাঁকে (রা.) জিজ্ঞেস করে, কোন বড় মাপের মানুষ যদি কোন দরিদ্র মানুষের মুখে চড় মারে তাহলে আপনি কী প্রতিক্রিয়া দেখান? তিনি (রা.) বলেন, আমি যা করি তা হলো, সেই ব্যক্তির মুখে উক্ত দরিদ্র মানুষ দ্বারা চড় মারিয়ে থাকি। সে বলল, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, যদি অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি চড় মারে তাহলে আপনি (তার সাথে) কী করেন? তিনি (রা.) বলেন, ইসলামে ছোট-বড় কোন ভেদাভেদ নেই। অতঃপর তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এই কাজ তু মি করো নি তো? তখন সে মিথ্যা বলে। সে বলল, আমি তো কাউকে চড় মারি নি, আমি কেবল একটি বিষয় জানতে চেয়েছি, এ কথা বলেই সে উক্ত বৈঠক থেকে উঠে পড়ে এবং নিজ সাঙ্গাপাঙ্গা নিয়ে নিজ দেশে চম্পট দেয়। অতঃপর তার পুরো জাতিসহ সে মুর্তাদ হয়ে যায় আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানবাহিনীর অংশ হয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

(আনোয়ারুল উলুম, খন্ড-১৬, পৃ: ৪২-৪৩)

ইসলামী রাষ্ট্র এমনই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে আর বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। প্রথমে যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি হলেন আব্দু ল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব, যিনি জার্মানির ওয়াইলডার্স হোস্ট জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সুইজারল্যান্ডের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়তও ছিলেন। তিনি গত ১২ মে তারিখে মাউন্ট এভারেস্টে সফলতার সাথে আরোহন এবং সেখানে আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করার পর অবতরনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে বিধবা স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে, এছাড়া তার পিতামাতা এবং এক ভাই ও দুই বোন রয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের আমীর তারেক আল-মু দাস্সের সাহেব লিখেন, আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আমৃত্যু জামা'তের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জামা'তের একজন সাধারণ সদস্য ও কর্মকর্তা হিসেবে মরহুম একজন আদর্শ আহমদী ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জামা'তী দায়িত্ব পালন করতেন। তার চরিত্রে অহংকার বা দাম্ভিকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি মানবসেবার

শুধু উপদেশই দিতেন না, বরং নিজের আদর্শে তা ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি IAAAE এর বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে আফ্রিকায়ও গিয়েছেন এবং সেখানে মানবসেবা করেছেন, যা দেখেআরো অনেক যুবক তার আদর্শ অনুসরণে আফ্রিকা গিয়েছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত হবার পর নিত্যনতুন সুযোগের সন্ধানে থাকতেন যদ্বারা যুবকদের তালীমতরবিয়তের ব্যবস্থা হতে পারে এবং তাদেরকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও আকর্ষণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। তার আর্থিক কুরবানীও আদর্শস্থানীয় ছিল। তার পুত্র স্নেহের তালহা ওড়ায়েচ বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে পড়াশোনা করছে। আমীর সাহেবই লিখেছেন যে, তিনি সন্তানের উত্তম তরবিয়ত দিয়েছেন। এর ফলেই তার ছেলে এখন জামেয়ায় পড়াশোনা করছে। এক কথায় বলা যায়, মরহুম আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আল্লাহ্ তা'লা ও মানুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ আহমদী ছিলেন।

তার মৃত্যুতে অ-আহমদীরাও অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছে। জনাব স্টিফেন লর্ড সাহেব লিখেন যে, ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব তার সাথে 'সুইস কম' কোম্পানীতে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন, যা সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী; এবং প্রায় এক বছর তার সাথে তার টীমে আমি কাজ করেছি। আমি শুধু তার পেশায় দক্ষতার কারণেই(তাকে) সম্মান করতাম না, বরং বিশেষভাবে তার আচরণের জন্য ও (সম্মান করতাম)। ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব সর্বদা সদাচরণ করতেন। তিনি পরোপকারী, সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বছিলেন। কাজের বাইরেও তার সাথে গল্প করতে আমার অনেক ভালো লাগতো।

মুরব্বী সাহেব লিখেন, তিনি অত্যন্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখতেন। রীতিমতো মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করতেন এবং অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযও মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল রিযওয়ান সাহেব বলেন, তিনি মাইক্রোসফট কোম্পানীর সুইজারল্যান্ডভিত্তিক শাখায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করছিলেন। একবার আমাকে বলেন যে, মাইক্রোসফট সুইজারল্যান্ডভিত্তিক শাখা বন্ধ করে সিলিকন ভ্যালীতে স্থানান্তর করছে। তারা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, আমাদের সাথে চলুন; সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে এবং বেতনও বৃদ্ধি পাবে আর সুইজারল্যান্ড থেকে আপনার সমস্ত আসবাবপত্র আমরাই স্থানান্তর করব। তিনি বলেন, আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি, কেননা এখানে আমার ওপর বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এখানকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সেখানে চলে যাব- এটি আমি চাই না। এর কিছুদিন পর তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহে এই শাখাকে সুইজারল্যান্ডের একটি বড় কোম্পানী 'সুইস কম' ক্রয় করে নিয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারা তো আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখানেই আমার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, বরং আল্লাহ্ তা'লার এরূপ অনুগ্র হ বর্ষিত হয়েছে যে, এখানে আমার বেতন আমার বসের (বেতনের) চেয়েও বেশি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে খারেজা জাহেদ সাহেব বলেন, ২৬ বছর যাবৎ আমি তাকে জানতাম। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় থাকাকালীন তার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। খুবই ভদ্র, নামায-রোযায় অভ্যস্ত, দোয়ায় অভ্যস্ত, কঠোর পরিশ্রমী, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান, স্নেহপরায়ণ বন্ধু আর মিশুক মানুষ ছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তিনি অন্যান্যযুবকের চেয়ে পৃথক প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। কখনো তাকে রাগান্বিত হতে দেখি নি আর তার চেহারায়ও কখনো এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি নি বা তার কথায়ও অনুভব করি নি। কখনো উচ্চস্বরে বা কঠোর ভাষায় কথা বলতে দেখি নি। আমাদের ভুল হলে সবসময় পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে কোমলতার সাথে বু ঝিয়ে দিতেন। ছোট-বড় সবার সাথে সর্বদা হাস্য-বদনে ভদ্রতার সাথে কথা বলতেন। হালকা মুচকি হাসি তার চেহারায় লেগে থাকত। প্রাণ, সম্পদ, সময় ও মান-সম্মান উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। সুইজারল্যান্ডের বহু যুবক এমন রয়েছে যাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি শুধু দিক-নির্দে শনাই প্রদান করেন নি, বরং তাদের অনেককেই আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে তিনি আহমদীয়া হাইকিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু যুবককে হাইকিং সম্পর্কে অবগত করেন। অসাধারণ দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। (জাহেদ সাহেব) বলেন, আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করি যে, হাইকিং করতে আপনার কোন ভয় হয় না? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ হয়, আর আমার পরিবারও এটি অপছন্দ করত, কিন্তু আমি এর যে সমাধান বের করেছি তা হলো, আমি যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করি, অর্থাৎ আমার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন, আর তাঁর সামনে এই প্রস্তাব রাখার চিন্তা করি যে, যদি তিনি অনুমতি দেন, (অর্থাৎ) যদি আমার পক্ষ থেকে তিনি অনুমতি পেয়ে যান, তিনি বলেন, তাহলে আমি সংকল্প করেছি, সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করে সেগুলোর ওপর আহমদীয়াতের পতাকা উড়াব। তিনি বলেন, তার শঙ্কা ছিল, আমি কোথাও তাকে নিষেধ না করে দিই, কিন্তু আমি তাকে বলি যে, যদি যেতে পার তাহলে পতাকা গেড়ে দাও।তিনি বলেন, এখন আমি তা-ই করব, ইনশাআল্লাহ্। এরপর এই যুবক আর কখনো পেছনেফিরে তাকান নি আর এই মহান লক্ষ্য অর্জ নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং একের পর এক পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে থাকেন। মরহুম পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টেও আহমদীয়াতের পতাকা উড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। লেখক লিখেছেন যে, আমি জানি না তার মৃত্যুকে শাহাদাত বলা যায় কিনা, তবে নিজ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বলতে পারি যে,মরহুমের মাঝে ঈমানের সেই স্পৃহা ছিল যা এমন পুণ্যবান লোকেরাই লাভ করে যারাশাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী থাকে। তবে আমার মতে তিনি নিশ্চিতভাবে এক সৎ উদ্দেশ্য এবংপ্রেরণার সাথে ইসলাম, আহমদীয়াত এবং খোদা তা'লার তওহীদের বাণী পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন আর তাতে সফলও হয়েছেন এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের সফরে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে গেছেন। তিনি নিশ্চিতরূপে শহীদের মর্যাদা পেয়ে থাকবেন। আল্লাহ্‌র কাছে

দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তার পিতা মোহতরম খাদেম হোসেন ওড়ায়েচ সাহেব বলেন, আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে, আমাদের এই পুত্র সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একের পর এক পাহাড়ে আরোহন করছে। সে আর পেছনে ফিরে তাকায় নি। আমার বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করত যে, আপনি তাকে বাধা দেন না কেন? এটি অত্যন্ত বিপদজনক একটি শখ। আমি উত্তর দিতাম, আমি বাধা দিলেও সে বিরত হবে না, কেননা তার ভেতরে একটি প্রেরণা কাজ করছে যে, আমি জামা'তের পতাকা পৃথিবীর সমস্ত উঁচু স্থানে উড়াব, আর আল্লাহ তা'লার তওহীদের বাণী পৌঁছাব।

এক বন্ধু লিখেছেন, আমি একবার সদর সাহেবকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনি যখন পাহাড়ে আরোহন করেন তখন নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মোবাইলে কি শুনেন? সদর সাহেব আমাকে উত্তর দেন যে, আমি হযরত আকৃদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ ডাউনলোড করেছি আর সফরে সেগুলো শুনি। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে আরেকবার আমি সদর সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, এত উচ্চতায় এবং ঠাণ্ডায় আপনি ইবাদত করেন কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, মুরব্বী সাহেব! পাহাড়ের চূড়ায় ইবাদত করতে আমার খুবই ভালো লাগে। আমার হৃদয়ে এ ধারণা জাগে যে, আল্লাহ্ তা'লার নবীরাও পাহাড়ের নির্জনে জগতের হট্টগোল থেকে দূরে গিয়ে ইবাদত করতেন। তিনি বলেন, আব্দুল ওয়াহীদ ওড়ায়েচ সাহেব আমাকে একবার এক সফরের ঘটনা শুনান যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল পাহাড় অর্থাৎ উত্তর আলাস্কার দিনালী পাহাড় চড়ার সময় তার তর্জনী ঠাণ্ডায় জমে যায় ও ইনফেকশন হয়ে যায়। তিনি যখন ডাক্তারকে সেই ক্ষত দেখান তখন ডাক্তার বলেন, এটি একেবারেই জমে গিয়েছে আর শরীরের অংশ নেই, এটি অকেজো হয়ে গেছে, সুতরাং এটিকে জরুরীভিত্তিতে কেটে ফেলে দিতে হবে। সদর সাহেব উত্তরে বলেন, এটি তর্জনী, এর মাধ্যমে আমরা নামাযে আল্লাহ্র একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করি, তাই এই আঙুল আমি কোনভাবেই কাটাব না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন আর যা ঘটেছে তা হলো, দোয়ার কল্যাণে সেই আঙুল সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও তাঁর পুণ্য সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। তার যেসব গুণাবলী মানুষ বর্ণনা করেছে এবং আমিও তার মাঝে দেখেছি, তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি সেসব গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন। খিলাফতের প্রতিটি নির্দেশে সাড়া দিতেন, শুধু মৌখিক দাবি নয় বরং বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠায় অগ্রগামী ছিলেন এবং আরো অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা চলে গেলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ধর্ম এবং তাঁর একত্ববাদের পতাকা প্রত্যেক উঁচু স্থানে প্রোথিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল, যাতে তিনি সফল হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো মোহতরমা আমাতুন নূর সাহেবার, যিনি ডাক্তার আব্দুল মালেক শামীম সাহেবের স্ত্রী এবং সাহেবযাদী আমাতুর রশীদ বেগম ও মিয়া আব্দুর রহীম সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ১৫ জুন ওয়াশিংটনে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। আল্লাহ্ তা'লা র

কৃপায় তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত আকৃদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর প্রদৌহিত্রী এবং নানার দিক থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) -এরও প্রদৌহিত্রী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাই সাহেবার দৌহিত্রী আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী বিহারের প্রফেসর হযরত আলী আহমদ সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তার স্বামী হলেন মৌলভী আব্দুল বাকি সাহেবের পুত্র ডাক্তার আব্দুল মালেক শামীম সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দু'টি কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাদের বিয়ের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পবিত্র কুরআনের নির্ধারিত আয়াতসমূহ পাঠের পর বলেন, নিকাহ্র ঘোষণার সময় যে আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, এগুলোর মাঝে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও রয়েছে যে, কর্মের সংশোধনের জন্য সহজসরল বক্রতামুক্ত কথা বলা আবশ্যক। অধিকাংশ দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা অপকর্মের ফলেই সৃষ্টি হয়। আর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপকর্মের মূল কারণ হলো, সহজসরল বক্রতামুক্ত কথা না বলা। যদি স্পষ্ট ও সোজাসরল মু'মিনসুলভ কথা বলা হয় তাহলে কোন ধরনের ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না আর কোন ধরনের অপ্রীতিকর বিষয় ও দুশ্চিন্তার আশঙ্কা থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের তৌফিক দান করুন এবং আমাদের সবার কর্মের সংশোধনের উপকরণ সৃষ্টি করুন আর আমাদের মাঝে যেন সত্য কথা বলার এমন অভ্যাস গড়ে উঠে যা আমাদের একটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। সেখানে তাঁর নিকাহ্ র সাথে আরো পাঁচ-ছয়টি বিয়ে হয়েছিল। তাদের বিয়ের ব্যাপারে তিনি (রাহে.) বলেন, এ বিয়েগুলোর একটি সম্পর্কের দিক থেকে এবং ভালোবাসার সম্পর্কের নিরিখে আমার নিজ মেয়েরই বিয়ে। এই মেয়ে মিয়া আব্দুর রহীম সাহেব ও আমার ছোট বোন আমাতুর রশীদ বেগমের কন্যা আমাতুন্ নূর, যার বিবাহ মৌলভী আব্দুল বাকী সাহেবের ছেলে ডক্টর আব্দুল মালিক শামীমের সাথে হচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া থাকবে, এইসম্পর্ক এবং বাকি সম্পর্কগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় প্রভূত সুখের ও আনন্দের উত্তরাধিকারী করুন। এরপর তিনি বিয়ের উভয়পক্ষ ও আহমদীয়াতকে সামনে রেখে বলেন, ইসলামের কল্যাণ কামনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এক সুদীর্ঘ চেষ্টা-সংগ্রামের পর আহমদীয়াত ইসলামের বিজয়ের ক্ষেত্রে শেষ এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে। এজন্য প্রজন্ম পরম্পরায় সঠিক তরবিয়ত লাভ এবং সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা মানুষের সাথে না থাকে তবে মানুষের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ, অনর্থকও নিষ্ফল হয়। অতএব, আমরা দোয়া করি, এসব বিয়ে এবং জামা'তের মধ্যে যেসব বিয়ে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেসব বিয়ের ফলেও যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইসলামের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপকরণ সৃষ্টি হয়।

সাহেবযাদী আমাতুন্ নূর সাহেবা জামা'তের কাজ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও ন্যাশনাল নায়েব সদর ছিলেন। এছাড়া ওয়াশিংটনের স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার বড় কন্যা আমাতুল মুজীব বলেন, তিনি সর্বদা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদিয়েছেন। মানুষের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীলা ছিলেন। কাউকে সাহায্য করা সম্ভব হলে অসাধারণভাবে সাহায্য করতেন। নিজের ইবাদতের বিষয়ে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচবেলার নামায ছাড়াও প্রতিদিনই রাতে যখনই আমি সজাগ হয়েছি তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আমাতুন্ নূর সাহেবার স্বামী অনেক দিন আগেই এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তার মেয়ে বলেন, আমাদের পিতার মৃত্যুর পর (আম্মা) বিশ বছর বৈধব্য কাটিয়েছেন। এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার পরিপূর্ণ ভরসা ছিল। কৃতজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষণীয়। তিনি বলতেন, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি ও দয়া অপরিসীম। তিনি বলেন, আমি তাকে সর্বদা একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি আরও বাড়িয়ে দিব, তাই সর্বদা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। উদারমনা হওয়া এবং হৃদয়কে প্রশস্ত রাখা, অতিথিসেবা করা, মানুষের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুণাবলী তার মাঝে অনেক বেশি ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার মায়ের মুখে অগণিতবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য শুনেছি যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ এটি নয় যে, কেউ তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চললে বিনিময়ে তুমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হলো, তোমার সাথে কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তুমি তার সাথে সু সম্পর্ক (বজায়) রাখবে। আমি আমার মায়ের মাঝে তার সব আত্মীয়তার গণ্ডিতে এ গুণ দেখেছি, সবার ভালোগুণ অনুসন্ধানকরতেন। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় এবং জামা'তের লোকজন এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও একান্ত যত্নবান ছিলেন। নতুন কোন অতিথি মসজিদে আসলে তাকে খুঁজতেন, এরপর তার সাথে বসে কথা বলতেন এবং তাকে স্বাগত জানাতেন। অনেকেই লিখেছেন, তিনি স্নেহশীলা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার অন্য কন্যাও লিখেছেন যে, জামা'তের লোকদের, বিশেষত নবদীক্ষিতাদের সাথে খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মানুষও তাকে খুব ভালোবাসত। প্রত্যেককে তিনি সাহায্য করতে চাইতেন। এই চিন্তায় থাকতেন যে, কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তার কোন অভাব থাকবে আর তিনি সেটা পূর্ণ করতে পারবেন না- এমনটি যেন না হয়। আমাতুন্ নূর সাহেবার বড় বোন আমাতুল বসীর সাহেবা লিখেন, সিস্টার শাকুরা নামী একজন আফ্রো-আমেরিকান মহিলা ছিলেন। তিনি যখন হজ্জ করতে যান তখন স্বপ্নে দেখেন, নওশী-র ঘর অর্থাৎ আমাতুন্ নূর সাহেবার ঘর (তাকে বাড়িতে নওশী বলে ডাকা হতো) মক্কায় অবস্থিত। সিস্টার শাকুরা যখন তার কাছে আসেন তখন তিনি বলেন, আমি আপনার যে সেবা করছি এর অর্থ হলো, আপনি আমার কাছে এসে গেছেন। তার বোন আমাতুল বসীর সাহেবা লিখেন, আফ্রিকান-আমেরিকান সিস্টার শাকুরা আঠারো বছর নওশীর কাছে ছিলেন। (এরমধ্যে) আট বছর পুরো শয্যাশায়ী ছিলেন, দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়েছিল এবং নওশী তার অনেক সেবা-যত্ন করেছে। তাকে নামাযও সে-ই পড়াতো, কারণ তিনি ভুলে যেতেন। (হুযূর বলেন,) আমিও দেখেছি, তিনি সিস্টার শাকুরার অনেক সেবাযত্ন করতেন। আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম তখন নিজেই তাকে হুইল-চেয়ারে বসিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে এসেছিলেন, আর সিস্টার শাকুরাও তার সেবাযত্নের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন।

তবলীগ করার আগ্রহ ছিল, কোন না কোন উপায়ে জামা'ত সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করতেন। কেউ যদি প্রশ্ন করত, পাকিস্তানের কোন স্থান থেকে এসেছেন? তবে সবসময় উত্তরে রাবওয়ার নাম উল্লেখ করতেন, আর এভাবে আলোচনা শুরু হয়ে যেত। ইহুদি ধর্মাবলম্বী একটি পরিবারের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য

হয়েছিল। সেই পরিবারের এক ভদ্রমহিলার নাম রুকাইয়্যা আসাদ; তিনি আমেরিকার ন্যাশনাল আমেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাতুন নুর সাহেবা অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার মাধ্য মে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছে।যে-ই তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছে, তারা সবাই তার গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে। তিনি কার্যত নিজের জীবন ইসলাম-আহমদীয়াতের শিক্ষানুসারে যাপন করেছেন, যার ফলে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হতো; আর তিনি মানুষের জন্য আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বাস্তব আদর্শ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে লাজনাদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সর্বদা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। ধৈর্য, অবিচলতা ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে নিজের সমস্যাবলী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মোকাবিলা করেছেন, আর এদিক থেকে তিনি অন্যদের জন্য (অনুকরণীয়) আদর্শ ছিলেন। ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নতুন অতিথিদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে ছিলেন। তরুণ এবং বার্ধক্যে উপনীত উভয় শ্রেণীর নারীদের জন্যই তিনি উত্তম আদর্শ ছিলেন। এই ভদ্রমহিলা লিখেন, আমার বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার হৃদয়ে তার জন্য শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনিআরও লিখেন, আমরা মুখে বলি যে, আমাদের খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা করা উচিত, দরিদ্র ও অভাবীদের খেয়াল রাখা উচিত; অথচ এক্ষেত্রে নওশী খালা অনাত্মীয় সদস্যদের সেবায় বছরের পর বছর নিজের ব্যক্তিগত সময়ও উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ নিজের জন্য কোন ব্যক্তিগত সময় রাখেন নি, (মানুষের) সেবায় রত থাকতেন। একইভাবে আরও কয়েকজন আহমদী মহিলা, বিশেষত আফ্রো-আমেরিকান ভদ্রমহিলারা লিখেছেন যে, আমাদের সাথে তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদেরকে অনেক কিছু অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরও সর্বদা তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। (হুযূর বলেন,) আমি তো এটাই দেখেছি যে, তিনি খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন; আমার প্রতিও তাকে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করতে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো, শ্রদ্ধেয়া বিসমিল্লাহ্ বেগম সাহেবার, যিনি হিফাযতে খাসএর (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ র নিরাপত্তা বাহিনীর) সাবেক কর্মকর্তা জনাব নাসের আহমদখান সাহেব বাহাদুর শের-এর সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি গত ১৪ জুন তারিখে জার্মানীতে ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতা হযরত চৌধুরী মাযহারুল হক খান সাহেব কাঠগড়ী'র মাধ্যমে। কাদিয়ানের বোর্ডিং স্কুলেও তিনি কাজকরার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে নিজের একটি কু র্তা বা জামাও উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। মরহুমা পাঁচ কন্যা ও দু'জন পুত্র রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মাহমুদ আহমদ সাহেব ফিজিতে মুরব্বী সিলসিলা ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত আছেন, তিনি (সেই) জামা'তের আমীরও বটে। তিনি অর্থাৎ আমাদের মুবাল্লেগ মাহমুদ আহমদ সাহেব লিখেন, শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুর পর জমিজমা থেকে যে আয়-উপার্জন হতো, তা থেকে সর্বপ্রথম তিনি চাঁদা প্রদান করতেন। পিতার পেনশনের টাকা সঞ্চয় করতেন এবং কোন কাজেই ব্যয় করতেন না। তিনি এই টাকায় দক্ষিণ তাহেরাবাদে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি আমাদেরকে সর্বদা নসীহত করেছেন যে, খিলাফতের আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখবে। এরপর তিনি লিখেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি একাই আমাদের সবাইকে মা-বাবা উভয়ের ভালোবাসা দিয়েছেন। তিনি কখনো আমাদেরকে পিতার অভাব বুঝতে দেননি। আমি তখন জামেয়া আহমদীয়ার প্রথম বর্ষে ছিলাম, তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, তুমি ধর্মের সৈনিক,তোমাকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছি, কাজেই যুগ খলীফা যেখানে দাঁড়াতে বলবেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমৃত্যু তিনি এমন কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি লিখেন, প্রথমদিকে শুধু আমার পিতাই আমাদের গ্রাম থেকে রাবওয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। প্রায়ই আমাদের আত্মীয়-স্বজন গ্রাম থেকে রাবওয়ায় আসতেন। তিনি সানন্দে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং সম্মানজনকভাবে সাধ্যাতীত আতিথেয়তা করতেন। প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখা তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন। আমার সহপাঠীদের সবসময় নিজ সন্তানতুল্য জ্ঞান করেছেন। ছাত্রাবাসে যেসব বিদেশী ছাত্র থাকত, তিনি প্রায়ই তাদেরকে (আমাদের) বাড়িতে নিয়ে যেতে বলতেন, যেন তাদের জামেয়াতে মন বসে যায়। জামেয়ার অধিকাংশ ছাত্র আমার মায়ের স্নেহ পেয়েছে, অনেক মু বাল্লেগ এর সাক্ষী। পাকিস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকান ছাত্ররাও (আমার) মায়ের এই স্নেহ পেয়েছে। তিনি বলেন, তার কাছে যত টাকা থাকত সব বিলিয়ে দিতেন বা চাঁ দা দিয়ে দিতেন, কিন্তু এগুলো তার কাছে রেখে দেওয়ার কথা বলার সাহস কারো ছিল না। আমি যেমনটি বলেছি, মুরব্বী সাহেব ফিজির আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত আছেন, তাই তিনি জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মানসিক প্রশান্তি দান করুন। মরহুমার অন্য সন্তানদেরও ধৈর্য ধারণের এবং তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতিক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কর্নেল জাভেদ রুশদী সাহেবের, যিনি রাওয়ালপিণ্ডি নিবাসী চৌধুরী আবদুল গনী রুশদী সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর পুরো সময় তিনি জামা'তের সেবায় রত ছিলেন। তিনি সেক্রেটারী তা'লীম, সেক্রেটারী ওয়াক্ফে জাদীদ, সেক্রেটারী রিশ্তানাতা ছাড়াও (নিজ) হালকার সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনবার রাওয়ালপিণ্ডির স্যাটেলাইট টাউনহালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত দোয়াগো মানুষ ছিলেন। নীরবে মানুষকে আর্থিক সাহায্য করতেন। সহানুভূতিশীল মনমানসিকতার অধিকারী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোকদের বিপদাপদের সময় সর্বদা সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন সুব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। নামাযান্তে তাদের সবার (গায়েবানা) জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

তালিমুল ইসলাম সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল ও নুসরত গার্লস স্কুলে শারির শিক্ষা, হিন্দি, কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিত এবং পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষিকার শূন্য পদে নিয়োগ হবে। জামাতের সেবায় আগ্রহী এবং কাঙ্খিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনকারী ইচ্ছুক প্রত্যাশীরা নাযারাত দিওয়ান -এর পক্ষ থেকে ছাপানো ফর্ম পূর্ণ করে নিজেদের আবেদন পত্র জমা দিতে পারেন। শূন্যপদের বিবরণ নিম্নরূপ:

১)P.G.T (Post Gruduate teacher) Physics: স্নাতকোত্তর শিক্ষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতকোত্তর এবং বি.এড এর পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

২) T.G.T (Trained Graduate general line teacher). শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং বি.এড ডিগ্রির পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। (স্নাতকোত্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে) ৩) কম্পিউটা টিচার, শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।
৪) Physical Education Teacher- শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫৫% নম্বর নিয়ে স্নাতক এবং যে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা।

TET or CTET উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।* প্রত্যাশীর বয়স ২০ বছরের কম এবং ৪০ বছরের বেশি না হয়।ব্যতিক্রম হিসেবে বয়স সীমায় ছাড় দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। *কর্মী নিয়োগ কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং নূর হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুসারে সুস্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হলে তবেই নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা হবে।

*প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণের বিষয়ে পরে জানানো হবে।*নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

আবেদন পত্রের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রগুলির (স্বপ্রত্যায়িত) অনুলিপি নাযারত দিওয়ান অফিসে এই ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। * ভাতা, বেতন ইত্যাদি তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ইমেল এবং নম্বরে অফিস টাইমে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ই-মেল: diwan@qadian.in
Office: 01872-501130, 9682627592, 9682587713

(নাযির দিওয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

করে না যে, যে মাহদী ও মসীহ (আ.)- এর আসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন? বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের একথা চিন্তা করা দরকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন-শুধু মুসলমানরাই হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে বসিয়েছে। অন্যথায় যে ঈসার আসার ভসিষ্যদ্বাণী ছিল তিনি এই উম্মত থেকেই আসতেন আর তিনি এসেও গিয়েছেন যাকে আমরা মান্য করেছি।

একজন প্রকৃত মোমেন যদি নিজের ঈমানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে, নিজের দেশ নিয়ে চিন্তিত থাকে, তবে সে খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগি হয়ে দোয়া করবে এবং তাঁর নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করবে।

দেখুন,এখানে ৩০টি ভিন্ন দেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন। যুক্তরাজ্যের জলসায় ৮০টি দেশের অতিথি অংশগ্রহণ করবেন, সমস্ত মানুষ এক হাতে ঐক্যবদ্ধ আর তারা ইসলামি শিক্ষার নমুনা প্রদর্শন করছে, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করছে। এই প্রমাণটিই কি যথেষ্ট নয় যে জামাত আহমদীয়া ইসলামের অনিন্দ সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করছে আর এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই হচ্ছে?

*একজন আরব বন্ধু এক মাস পূর্বেই আহমদী হয়েছেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, ইতালিতে তাঁর স্ত্রী সন্তান, পিতামাতা এবং ভাইয়েরা যৌথ পরিবারে থাকেন। নিজের এলাকার নামায সেন্টারে তিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন। এক মাস পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আহমদীয়াতে নেয়ামত দান করার পর নামায সেন্টারে যাওয়া তিনি ছেড়ে দেন। এখন নামাযের সময় হলে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনেরা বিদ্রুপের সুরে বলে, 'এস, আমাদেরকে নামায পড়াবে না?'

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে বলো, 'আমি শুধু মোমেনদের ইমাম, মোমেনদেরই ইমামতি করব।'

ফ্রান্স থেকে আসা এক আরব আহমদী বলেন-

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ)-এর মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে আমি একটি স্বপ্নে দেখি, কেউ আমাকে বলছে-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي

এরপর এক যুবককে দেখি যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নের মধ্যে বলা হয় যে ইনি তোমাদের নতুন নেতা তথা খলীফা।

এই স্বপ্নের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ)-এর মৃত্যু হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) নির্বাচিত হলে এই স্বপ্নটি আমার মনে পড়ে যায়। কেননা স্বপ্নে দেখা সেই নতুন নেতা তথা খলীফাই ছিলেন হুযুর আনোয়ার (আই.)।

এক ব্যক্তি বলেন- '২০০৬ থেকে আমি আহমদী। আমি অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। আমার আহমদী হওয়ার কারণে স্ত্রী আমার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন। বউও পেয়ে যাবেন।'

ফিলিস্তিন সংকটের বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন-সেই দোয়া করুন যা মোমেনদের দোয়া। একটি জামাত হিসেবে দোয়া করুন। তবেই সমস্যার সমাধান হবে। দোয়ার মাধ্যমে সমস্যা দূর হবে এবং সাফল্য আসবে।

১৫ই জুন, ২০১৪

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ,তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন-

আল্লাহ্ শব্দটি এমন একটি শব্দ যা মসুলমানরা অত্যধিক হারে ব্যবহার করে। কেউ কোনও নেয়ামত লাভ করলে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে। আবার কেউ অভ্যাসগতভাবে পরিবেশের প্রভাবের কারণে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। এমন মানুষও আছে যারা নিজেদের দুর্বলতা, অযোগ্যতা এবং অলসতাকে খোদার প্রতি আরোপ করে বলে, এটিই আল্লাহ্র তকদীর বা নিয়তি ছিল। তারা ভুলে যায় যে আল্লাহ্ তা'লা প্রচেষ্টার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর প্রতি আস্থা রাখতে বলেছেন। যাইহোক, পৃথিবীতে বসবাসকারী মুসলমানদের অধিকাংশ আল্লাহকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার মারেফাত ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তারা না জানে ঐশী ভালবাসা অর্জনের পথ, না জানে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথ। আর কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হয় বা এই যুগেও যে তা হতে পারে না কি সেগুলি কেবল পুরোনো কেচ্ছাকাহিনী ছিল- সে বিষয়েও তারা অনভিজ্ঞ।

আজ বর্তমান যুগে আহমদী মুসলমানেরাই এই সব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান রাখে। এই কারণে যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এই বিষয়গুলির তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এই সত্যকে জানা প্রত্যেক আহমদীর জন্য জরুরী, যাতে খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও বেশি ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞান লাভ হয় আর এতে ক্রমোন্নতি হয় এবং অবশেষে খোদা তা'লার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্টেজের পিছনে আল্লাহ্র নাম সম্বলিত বিশালাকায় ব্যানার লাগানো আছে। এই শব্দটি আমাদের ঈমানের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। কিছু মানুষ এমন আছেন যারা মনে করে আল্লাহ্ তা'লা শুধু মুসলমানদের, তারা যেন আল্লাহ্র ইজারাদারি নিয়ে রেখেছে। যেমন মালেয়েশিয়ার উলেমাদের সিন্ধান্ত, 'খৃষ্টানরা আল্লাহ্ শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। আর সেখানকার আদালতও তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বহু খৃষ্টানকে শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, আল্লাহ্ শব্দ, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা-এগুলি তারা জানেও না, আর জানার চেষ্টাও করে না। আর অত্যন্ত অগভীর ভাবে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- এখন আমি হযরত মসীহ মও্উদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যাতে তিনি আল্লাহ্র সত্যতা, মারেফাত, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, তাঁর নৈকট্য অর্জনের পথ-ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ভাষার গভীরতা এবং এই বিষয়ের স্পষ্টীকরণই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করতে পারে, তাঁর নৈকট অর্জনকারী বানাতে পারে আর আমরা সেই উদ্দেশ্যাবলী অর্জনকারী হতে পারি যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত -এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন যে আল্লাহ্ তা'লা বা আল্লাহ্ খোদা তা'লার আদি নাম যা সকল গুণের সমষ্টি, অন্য কোন ধর্ম আমাদেরকে খোদা তা'লার এই প্রাথমিক নামের সঙ্গে পরিচয় করায় নি বা তাঁর অনুসারীদেরকেও করায় নি।আর এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর থেকে ভাল খোদাকে সনাক্তকারী আর কেউ নেই। অতএব, তাঁর বাণী দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার তত্ত্বজ্ঞান, ভালবাসা এবং নৈকট্য অর্জনের পথ সম্পর্কে জ্ঞান করার চেষ্টা করা উচিত। এই কারণেই আজকে আমি এই উদ্ধৃতিগুলি নির্বাচন করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন-পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্ তা'লার সত্যতা সম্পর্কে অবগত করতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতটা আকুল ছিলেন তা তাঁর এই বাণী থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন- 'আমার সহানুভূতির আবেগের প্রধান অনুঘটক হল আমি একটি স্বর্ণ খনি আবিষ্কার করেছি আর আমি মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সৌভাগ্যশত আমি সেই খনি থেকে পেয়েছি একটি উজ্জ্বল ও অমূল্য হিরে, যা এতটাই মূল্যবান, যদি সমগ্র মানবজাতির কাছে এর মূল্যটি বিতরণ করে দিই, তবে প্রত্যেকেই সেই ব্যক্তির থেকে বেশি ধনী হয়ে উঠবে আজ পৃথিবীতে যার কাছে সব থেকে বেশি সোনা ও রুপো আছে। সেই হিরে কি? প্রকৃত খোদা। আর তা অর্জন করার অর্থ হল তাঁকে চেনা এবং সত্যিকার অর্থে ঈমান আনা এবং অকৃত্রিম ভালবাসাসহকারে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা এবং প্রকৃত বরকত লাভ করা। অতএব, এমন অকুত সম্পদ লাভ করেও যদি আমি মানবজাতিকে বঞ্চিত রাখি, তারা অনাহারে মারা যায় আর আমি বিলাসিতা করতে থাকি, তবে তা তো ঘোর অন্যায়। একাজ আমার দ্বারা কখনই হবে না। তাদের অভাব অনটন দেখে আমার হৃদয় পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তাদের (হৃদয়ের) অন্ধকার এবং অস্বচ্ছলতা দেখে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। আমার ইচ্ছে, স্বর্গীয় সম্পদে তাদের গৃহ পূর্ণ হোক এবং সত্য ও বিশ্বাসের মণিমানিক্য এত বেশি লাভ করুক যেন তারা স্বচ্ছল হয়ে যায়।

অতঃপর তিনি খোদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- 'সেই খোদা যিনি, সকল নবীর উপর প্রকাশিত হয়ে এসেছেন, হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্র উপর তুর পাহাড়ে প্রকাশিত হয়েছেন এবং হযরত মসীহ্-র উপর শেইর এর পাহাড়ে উদিত হয়েছেন এবং হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)এর উপর ফারান পাহাড়ে উদিত হয়েছেন। সেই সর্বশক্তিমান খোদা আমার উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাকে বলেছেন, 'আমিই সেই মহান সত্তা যার ইবাদতের জন্য সকল নবীদের প্রেরণ করা হয়েছে। আমিই একমাত্র

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

স্রষ্টা এবং অধিপতি, কেউ আমার অংশীদার নেই। জন্ম কিম্বা মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করে না।' আর আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপর) পৃথিবীর অধিকাংশ খৃষ্টান হযরত মসীহ সম্পর্কে যা কিছু বিশ্বাস পোষণ করে, অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ প্রভৃতি, সেগুলি মনুষ্যজনিত ভ্রান্তি তথা প্রকৃত শিক্ষার বিকৃতি। খোদা তাঁর জীবন্ত বাণী দ্বারা সরাসরি আমাকে জ্ঞাত করেছেন এবং বলেছেন, যদি লোকে বলে, 'তুমি যে খোদার পক্ষ থেকে তা আমরা কিভাবে বুঝব?' একথা বোঝাতে যদি তোমার জন্য কষ্টের হয়, তবে তুমি তাদের বলে দাও যে তাঁর স্বর্গীয় নিদর্শন সাক্ষ্য হিসেবে আমার জন্য যথেষ্ট।

দোয়া গৃহীত হয়। সময়ের পূর্বে অদৃশ্যের সংবাদ জানানো হয় এবং সেই সব রহস্য যা খোদা ছাড়া কেউ জানে না তা সময়ের পূর্বে প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় নিদর্শনটি হল, কেউ যদি এগুলির মোকাবিলা করতে চায়, যেমন- কোনও দোয়া গৃহীত হওয়া বা সময়ের পূর্বে সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার সংবাদ দেওয়া কিম্বা অদৃশ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যা মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে, সেই মোকাবিলায় এমন ব্যক্তি পরাস্ত হবে।"

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে নি, আর যারা এসেছে তারা পরাস্ত হয়েছে, অপদস্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'লা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনে পরিণত করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক তৈরী করা যায় তা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- 'তিনিই সত্যিকার খোদা যাঁর অপরিবর্তনশীল গুণাবলী আদিকাল থেকে পৃথিবীর বুকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁর কোনও পুত্র থাকবে আর সে আত্মহত্যা করবে, তবেই মানুষের মুক্তি ঘটবে- এমন বিষয়ের তিনি মুখাপেক্ষী নন। মুক্তির প্রকৃত পথ আদিকাল থেকে সেই একই আছে, যা মানুষের কথা এবং কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত, যে পথে বিচরণকারীরা প্রকৃত মুক্তি এবং এর ফল ইহজগতেই লাভ করে এবং এর সত্যিকার নমুনা নিজের মধ্যে ধারণ করে। অর্থাৎ সেটিই সত্য পথ যা ঐশী আহ্বানকে গ্রহণ করে তার পদচিহ্নকে এমনভাবে অনুসরণ করে যার ফলে আপন অস্তিত্ব মুছে যায় আর এভাবে নিজেই নিজেকে উৎসর্গ করে। এটিই সেই পথ যা খোদা তা'লা সূচনা লগ্ন থেকে সত্যান্বেষীদের প্রকৃতিতে নিবিষ্ট রেখেছেন। (অর্থাৎ নিজ সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়ে খোদা তা'লার আদেশের সামনে সব কিছু উজাড় করে নিজের জীবন খোদার সমীপে নিবেদন করা। আদিকাল থেকে, যখন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার আধ্যাত্মিক আত্মোৎসর্গীকরনের উপকরণ তাকে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রকৃত সেই উপকরণ সঙ্গে করে এনেছে আর সে বিষয়ে সতর্ক করতে বাহ্যিক কুরবানীও রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি কখনও কোন বিষয় নিয়ে এমন আশ্চর্য হই নি, যেমনটি তাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হই যারা পরিপূর্ণ, জীবন্ত ও চিরস্থায়ী খোদাকে ত্যাগ করে এমন অনর্থক চিন্তাধারার অনুসরন করে আর তা নিয়ে গর্ব করে।"

এরপর কিভাবে মানুষ খোদা তা'লার প্রকৃত পরিচয় লাভ এবং তাঁর সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক তৈরী করতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, 'অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ আছে যে খোদা তা'লার সত্তা যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, তিনি অবিনশ্বর। তিনি চান, মানুষও তাঁর শিক্ষার অনুসরণ করে ত্রুটিমুক্ত হোক। তিনি বলেন= 'মানা কানা ফি হাযিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীকে অন্ধ থাকবে, সেই সত্তাকে অবলোকন করতে সক্ষম হবে না, সে মৃত্যুর পরও অন্ধই থাকবে, অন্ধকার তার পিছু ছাড়বে না। কেননা খোদাকে দেখার জন্য এই পৃথিবীতেই অনুভূতি লাভ হয় আর যে ব্যক্তি সেই সব অনুভূতিকে পৃথিবী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না সে পরকালেও খোদাকে দেখতে পাবে না। এই আয়াতে খোদা তা'লা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি মানুষের কোন উন্নতি চান আর মানুষ তাঁর শিক্ষা অনুসরণকরে কোথায় পৌঁছতে পারে। এরপর তিনি কুরআন শরীফে এই শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে এবং যার বাস্তবায়নের ফলে এই পৃথিবীতেই খোদার সাক্ষাত দর্শন হতে পারে যেমন- তিনি বলেন,

" যে ব্যক্তি চায় ইহজগতেই সেই খোদার সঙ্গে সাক্ষাত দর্শন হোক যিনি প্রকৃত খোদা এবং সৃষ্টিকর্তা, সে যেন এমন পুণ্যকর্ম করে যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে। অর্থাৎ তার কর্ম যেন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয়। আর এর কারণে তার মনে যেন আত্ম অহংকার জন্ম না নেয়। তার কর্মের মধ্যে যেন কোন প্রকার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা না থাকে।.......... তার কর্ম যেন কেবল সততা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ হয়। এর পাশাপাশি যাবতীয় প্রকারের শিরক থেকেও যেন বিরত থাকে। সূর্য, চন্দ্র, আকাশের নক্ষত্ররাজি, অগ্নি, জল কিম্বা কোন পার্থিব বস্তুকে যেন উপাস্য হিসেবে গ্রহণ না করা হয়, কিম্বা জাগতিক উপকরণসমূহকে যেন এমন সম্মান না দেওয়া হয় ও সেগুলির উপর নির্ভর করা হয় যাতে সেগুলি খোদার শরিক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। আর নিজের উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টা নিয়ে যেন গর্ব না করা হয়। কেননা এটিও শিরকের একটি প্রকারভেদ। সব কিছু করার পরও যেন মনে করা হয় যে 'আমি কিছুই করি নি'। নিজের জ্ঞান নিয়ে যেন অহংকার না করা হয় আর নিজের কর্ম নিয়ে গর্ব না করা হয়। বস্তুত নিজেকে যেন অজ্ঞ এবং অলস মনে করে আর খোদা তা'লার আশ্রয়ে সর্বক্ষণ তার আত্মা বিনীত থাকে আর দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কল্যাণ নিজের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় যে প্রবল তৃষ্ণার্ত এবং হাত-পা বিহীন আর তার সামনে একটি প্রস্রবণ দেখা যাচ্ছে যার পানি অত্যন্ত পরিশুদ্ধ এবং সুমিষ্ট। অতএব, যে করেই হোক, সেই প্রস্রবন পর্যন্ত সে পৌঁছে গেল।"

তিনি বলেন, "তিনি জড় চোখ ছাড়াই দেখেন এবং জড় কান ছাড়া শোনেন এবং জড় জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। অনুরূপভাবে বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা তাঁর কাজ। যেমনটি তোমরা দেখতে পাও, স্বপ্নের দৃশ্যে কোনও পার্থিব উপকরণ ছাড়াই তিনি এক জগত সৃষ্টি করেন, নশ্বর ও অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করেন। অনুরূপভাবে রয়েছে তাঁর শক্তিসমূহ। নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে তাঁর শক্তিসমূহকে অস্বীকার করে। সেই ব্যক্তি অন্ধ যে তাঁর এই গভীর শক্তিসমূহ সম্পর্কে উদাসীন। তিনিই সব কিছু পরিচালনা করেন এবং করতে পারেন সেই সব বিষয় ছাড়াই যেগুলি তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী অথবা তাঁর মেয়াদ বিরুদ্ধ। তিনি অদ্বিতীয় স্বীয় সত্তায়, গুণাবলীতে, ক্রিয়াকাণ্ডে এবং শক্তিসমূহে। তাঁর কাছে পৌঁছনোর জন্য সকল দ্বার রুদ্ধ, কেবল একটি দ্বার ভিন্ন যা ফুরকান মজীদ উন্মুক্ত করেছে।"

অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

স্পেনের মুরসিয়া অঞ্চলের এক নবাগত আহমদ বলেন- আমি আত তৈয়্যবুল ফারাহ নামে এলাকার এক মরোক্কিয়ান আহমদীর সঙ্গে কাজ করতাম, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ধার্মিকতা দ্বারা আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছিলাম। একবার আমি দেখলাম, বেশ কয়েকজন লোক তৈয়্যব সাহেবকে নিয়ে উপহাস করছে। একদিন কেউ আমাকে বলল, 'তুমিও কি কাদিয়ানী? আমি বললাম, সেটা আবার কি জিনিস? তারা বলল, তৈয়্যব সাহেব কাদিয়ানী। আমি যখন তৈয়্যব সাহেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সবিস্তারে জানালেন। এরপর আমি যখন এম.টি.এ দেখলাম, তখন সেখানে বসে থাকা জ্যোতির্মন্ডিত মুখগুলি দেখে আমার স্ত্রী বললেন, এরা মিথ্যাবাদী হতে পারে না। এরপর আমরা অনেক অনুসন্ধান করার পর বয়আত করে নিলাম।

বয়আতের পর স্বপ্নে আমি দেখলাম, আমি এবং আমার স্ত্রী হুযুর আনোয়ারের বাড়ি এসেছি। দরজার কড়া নাড়লে হুযুর আমাদেরকে ভিতরে বসতে দিলেন এবং আপ্যায়ন করলেন। এরপর আমরা হুযুরের পিছনে নামায পড়লাম।

হুযুর আনোয়ারকে জানানো হল যে তৈয়্যব সাহেব চার বছর পূর্বে বয়আত করেছিলেন, যখন তিনি একাই আহমদী ছিলেন। তিনি হুযুরকে বার বার চিঠি লিখে জানাতেন যে লোকেরা তাকে নিয়ে উপহাস করে। দোয়া করুন, এখানকার মানুষ যেন আহমদীয়াত গ্রহণ করার দিকে আকৃষ্ট হয়। হুযুর আনেয়ার চিঠির উত্তরে লেখেন- 'আপনি 'রাব্বি লা তাযিরনি ফারদানন ও আনতা খায়রুল ওয়ারেসিন' দোয়া পাঠ করবেন। এটি হুযুর আনোয়ারের দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি নিদর্শন ছিল, মুরসিয়ার সেই বন্ধু আহমদী হয়েছেন, এরপর তাঁর পুরো পরিবার আহমদী হয়েছে। আরও দুইজন ব্যক্তিও বয়আত করেছেন। উক্ত এলাকায় আহমদীর সংখ্যা এখন ১১ জন আর সেখানে যথারীতি জামাতও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

এক আরব অতিথি প্রশ্ন করেন, পোশাক পরিধানের দ্বারাও কি কারো ধর্ম প্রকাশ পায়? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের কোন বাহ্যিক পোশাক নেই। ধর্মের পোশাক হল 'লিবাসুত তাকওয়া' বা তাকওয়ার পোশাক। মানুষের পোশাক যেন হয় লজ্জা নিবারণ এবং লজ্জাশীলতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। 'লিবাসুত তাকওয়া'-ই হল ধর্মের পোশাক। কেউ যদি আরবদের পোশাক চোগা পরিহিত থাকে, আর সে অন্যকে কষ্ট দিচ্ছে, অন্যরা তার হাত থেকে নিরাপদ না থাকে, তবে তার চেয়ে ভাল মুসলমান হিসেবে পরিচয় না দেওয়া।

এক যুবক প্রশ্ন করে যে আমার দাদি পাকিস্তানে মৃত্যু বরণ করেছেন। আত্মীয়স্বজনরা সব অ-আহমদী। আমরা এখানে তিন ভাই বোন রয়েছি। আমরা যদি পাকিস্তান যাই, তবে সেখানে কিভাবে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ভালভাবে যান, তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করুন এবং নিজেদের উন্নত চারিত্রিক গুণ তাদের সামনে প্রদর্শন করুন। আপনারা তো যুগের ইমামকে মান্য করেছেন। তাই সেখানে যে মৌলবীরা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কে গালি দেয়, তাদের পিছনে নামায পড়বেন না। আর আপনারা নিজেদের উন্নত আচরণ সেখানে প্রদর্শন করতে থাকবেন। আর পরিস্থিতির বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং

সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বন করবেন। নিজের কোন কথার কারণে অকারণে নিজের জীবনকে বিপদে ফেলা সমীচীন নয়।

মেসিডোনিয়া থেকে আসা দুই ভাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের এক ভাই আহমদী আর অপরজন এখনও বয়আত করে নি। অ-আহমদী ভাই প্রশ্ন করে যে আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে পার্থক্য কি?

প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমার ভাই আহমদী, তুমি কি নামায ও কুরআনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেছ?' সেই ভাই উত্তর দিল, না, কোন পার্থক্য নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.), যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন, তাঁকে স্বয়ং তিনি একটি হাদীসে চারবার আল্লাহ্‌র নবী বলে সম্বোধন করে বলেছেন, শেষ যুগে নবী আসবেন আর তিনি উম্মতি নবী হবেন। অর্থাৎ নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না। নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত এবং পথেই আসবেন আর তিনি নবী করীম (সা.)-এর শরিয়ত নিয়ে আসবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানদের বিশ্বাস, আগমণকারী মসীহ আকাশ থেকে নেমে আসবেন, আর যখন তিনি আসবেন, তিনি নবী হবেন। এখন একদিকে তারা বলে, আঁ হযরত (সা.)-এর পর কোনও প্রকারের নবী আসতে পারে না, তবে মসীহ (আ.) যখন আকাশ থেকে নেমে আসবেন, তখন নবী উপাধি কি ফিরিয়ে নেওয়া হবে? আর যদি এমনটি না হয় তবে এর অর্থ হল আঁ হযরত (সা.)-এর পর নবী আসতে পারে। আর নবী যদি আসতে পারে, তবে অন্য কোন ধর্মের নবী নেওয়ার পরিবর্তে নবী করীম (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকেই কেন নবী আসবে না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: নবী প্রেরণ করা খোদা তা'লার অধিকারভুক্ত বিষয়। কুরআন করীম ঘোষণা করে, খোদা তা'লা নবী প্রেরণ করতে পারেন, কেউ এতে বাধা দিতে পারে না। নবী নতুন শরিয়ত নিয়ে নয়, পূর্বের শরিয়ত নিয়ে আসতে পারে আর সে হবে উম্মতি নবী।

হুযুর আনোয়ার প্রশ্নকারী অ-আহমদী বন্ধু সম্পর্কে বলেন, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান না থাকলেও তাঁর চেহারা বলে দিচ্ছে তিনি সত্যের সন্ধানে আছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোন পথটি সঠিক তার পথ প্রদর্শন পাওয়ার জন্য তাঁকে খোদা তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত। আহমদীয়াত সত্য কি না সে বিষয়ে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শন গ্রহণ করুন।

জার্মানী থেকে আসা এক নবাগত আহমদী প্রশ্ন করেন, 'আমি বার্লিনে কাজ করছি। সেখানে আমার সহকর্মীরা আমাকে কাফের বলে ডাকে। আমার কি করণীয়?

প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করে তাকে কাফের বলো না। আপনি কলেমা পাঠ করেন। নামায পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং নবী করীম (সা.)এর উপর ঈমান আনেন।

আপনি বলবেন, আমার বিশ্বাস, আমি একজন সত্যিকার মুসলমান আর আপনারা যারা যুগের ইমামকে মানেন না, তা সত্ত্বেও আমি বলছি, আপনারা যেহেতু কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করেন, তাই আপনারা মুসলমান।

আপনারা আমাকে কাফের বলতে চান, নিশ্চয় বলুন। এটি আপনাদের এবং খোদার মধ্যবর্তী বিষয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সব সময় 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযিম' পড়বেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জনকারী ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া

বেলজিয়ামে বসবাসরত মরোক্কোর মহম্মদ তুলুবি আব্দুল কাদির সাহেব নামে এক বন্ধু নিজের চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- ছয় বছর পূর্বে আমি আহমদীয়াতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আহমদীয়াতের সন্ধানে জামাতের একটি নামায সেন্টারে গিয়ে পৌঁছই এবং জামাতের বিষয়ে আরও বেশি করে পরিচিত হই, নামাযের জন্য এবং জুমআর নামাযের জন্য সেন্টারে আসতে শুরু করলাম। আমাকে জার্মানী জলসা সালানার জন্য আমন্ত্রিত করা হয় আর আমি এতে অংশগ্রহণ করি। জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে এবং হুযুরের প্রতি জামাতের সদস্যদের ভালবাসা ও আনুগত্য দেখে আমার মনে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। আমার ধারণা হয়েছে যে নিশ্চয় এটি সত্যবাদীদের জামাত, এর ফলে আমি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সিন্ধান্ত নিই এবং অবশেষে আমি বয়আত করে নিই।

সুইডেনে বসবাসরত ইরাকের আব্দুর রহীম সাহেব একজন তবলীগাধীন বন্ধু জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কিছু কালের জন্য সুইডেন থেকে বেলজিয়ামে এসেছেন। সেখানকার এক নবাগত মোরোক্কিয়ান আহমদীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তিনি জামাত সম্পর্কে তাঁকে পরিচত করেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন এবং তাঁকে জলসা সালানা জার্মানীর জন্য আমন্ত্রিত করেন। তিনি জলসায় এসে এখানকার আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে ভীষণ প্রভাবিত হন। তাঁর মতে, এটিই সেই প্রকৃত ও সত্যিকার জামাত যার সন্ধানে আমি ছিলাম। আর এই জামাত আহমদীয়াই আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর।

ভদ্রলোক জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

বেলজিয়াম থেকে আগত মোরোক্কান নবাগত আহমদী খাদিজা সাহেবা বলেন- ২০১০ সালে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে ইমাম মাহদী এসেছেন আর চাঁদের আলোর ন্যায় তিনি বললেন, তোমাকে সুসংবাদ! তোমাকে সুসংবাদ। পরে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস কে দেখি, যিনি ইংরেজিতে বলছেন 'ডোন্ট ওয়ারি'। এই সম্মানীয় ব্যক্তি কে, এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চিত্র দেখে বুঝলাম, তিনি তো সেই ব্যক্তি যাঁকে স্বপ্নে আমি ইমাম মাহদী হিসেবে দেখেছি। এরপর আমি যখন যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করলাম, তখন হুযুর আনোয়ারকে দেখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, এই উচ্ছ্বাসে যে, তিনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায় যে, এটি সত্য এবং প্রকৃত জামাত। এরপর বয়আত করে আমি আহমদীয়াতে প্রবেশ করি।

বেলজিয়াম থেকে ঘানা বংশোদ্ভূত এক বন্ধু আব্বাস সাহেব জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আর জলসার শেষ দিন বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে দেখি আমি খোদাকে দেখছি। আর খোদা তা'লাও আমার প্রতি স্বীয় কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। একটি তবলীগি বৈঠকে সভায় গিয়ে সেখানে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে আমার মনে পড়ল যে তিনি সেই ব্যক্তি যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। মিটিং চলাকালীন সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে অবিরাম আমি কাঁদতে থাকি আর আজ আমি জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। আমি বয়আত করার সিন্ধান্ত নিয়েছি।

আমি আহমদীয়াতের প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে বলি, যদি তারা জলসার পরিবেশ দেখে আর একবার জলসায় অংশ গ্রহণ করে, তবে আমার বিশ্বাস, তারা বিরোধিতা ত্যাগ করবে।

হাঙ্গেরী থেকে আসা অতিথিদলের ইনচার্য সাদাকাত আহমদ বাট সাহেব বলেন, জার্মানীতে তাঁর এক পরিবারের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। তাঁকে জামাতের বিষয়ে যথেষ্ট জানানো হয়েছিল। এবছর আমি জার্মানীর সালানা জলসায় এলে এই পরিবারটিকেও জলসায় আসার আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনোভাব ভাল ছিল না। এমনকি তারা জলসায় অংশগ্রহণ করতেও ইচ্ছুক ছিল না। তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়, অবশেষে তারা জলসায় আসার জন্য প্রস্তুত হয়।

তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। নামাযের সময়ের যে পরিবেশ ছিল, সেটিও তাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এই ধরণের পরিবেশ জীবনে তারা প্রথম দেখেছিল। এরপর সন্ধ্যার সময় যখন হুযুরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল, তখন এতেও তারা ভীষণ প্রভাবিত হন। তারা বলেন, খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে আমরা প্রায়ই সাক্ষাত করে থাকি। কিন্তু তাদের কথা কোনেই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। আমি তাদের কথা এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিই। কিন্তু হুযুর আনোয়ার -এর কথাগুলি জ্যোতির কিরণের ন্যায় আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে।

ফ্রান্স থেকে আসা এক বন্ধু বলেন, 'এক আহমদী বন্ধুর মাধ্যমে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমি এক খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি কোন ধর্মাচার অনুশীলন করি না। চার্চে গিয়ে দেখি সামনে হযরত ঈসা (আ.)এর মূর্তি বসানো আছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে খোদার ইবাদত করব না কি এই মূর্তির ইবাদত করব? যে আহমদী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, তিনি জামাত সম্পর্কে আমাকে তথ্য দিলেন এবং ইসলামী নীতি দর্শন আমাকে পড়ার জন্য দিলেন। আমি জলসাতেও অংশগ্রহণ করলাম, হুযুরের ভাষণ শুনলাম আর এরফলে আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে গেল। জলসার তৃতীয় দিন আমি বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করলাম।

এক সিরিয়ান পরিবার বয়আত করে ফিরে গেলে সেখানে তাদের বন্ধুরা সাক্ষাত করতে আসে। মহিলারা তাঁর স্ত্রীকে বলতে শুরু করে যে, তারা তো কাফের, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করাও বৈধ নয়। সেই নবাগত আহমদী পরিবারটি উত্তর দেয়, তারা কোনও দিক থেকেই কাফের হতে পারে না। আমরা তিন দিন আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল এবং কুরআন করীমের কথা ছাড়া কিছুই শুনি নি। এটি এমন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ যা আমরা অন্যত্র কোথাও দেখি নি, তারা যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করছে, অন্য কেউ তা পারবে না। যারা ইসলামকে এমন অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে, তারা কিভাবে কাফের হতে পারে? (ক্রমশ.......)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 29 July, 2021 Issue No.30

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

একত্ববাদের পর শিরক এবং শিরক-এর পর একত্ববাদের যুগ পর্যায়ক্রমে আসতে থাকে। আর সব সময় একত্ববাদের যুগের পরই শিরকের যুগ আসে। এই নীতি অনুসারে একত্ববাদকে ইলহামী এবং শিরককে অবনতির একটি পর্যায় বলে ধরে নিতে হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- এই দোয়া থেকে জানা যায় যে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন ছিলেন যে মক্কার এলাকায় শিরক বিস্তৃত হতে চলেছে। এই কারণেই তো তিনি দোয়া করেন,' হে খোদা আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে শিরক থেকে দূরে রেখো। অন্যথায় যে সময় দোয়া করা হয়েছিল, তখন মক্কায় শিরক-এর নামচিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। কেবল সেখানে হযরত ইসমাঈলের ঘর ছিল কিম্বা সেই সব মানুষ বসবাস করত যারা তাঁর অনুসারী ছিল।

এই দোয়া দ্বারা এও জানা যায় যে একত্ববাদ ও শিরক পালা করে পৃথিবীতে আসতে থাকে; একত্ববাদে বিশ্বাসী জাতিসমূহ মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়, তেমনি মুশরিক জাতি একত্ববাদীতে পরিণত হয়। একত্ববাদের সুউচ্চ মানে উপনীত জাতি সম্পর্কেও বলা যায় না যে এখন তারা শিরকের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেল। এই শিক্ষা দ্বারা এমন চিন্তাধারার খণ্ডন হয় যা ধর্ম বিশ্লেষকরা উপস্থাপন করে থাকে। অর্থাৎ শিরক থেকে ক্রমোন্নতি করতে করতে একত্ববাদের জন্ম হয়েছে। কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে একত্ববাদের পর শিরক এবং শিরক-এর পর একত্ববাদের যুগ পর্যায়ক্রমে আসতে থাকে। আর সব সময় একত্ববাদের যুগের পরই শিরকের যুগ আসে। এই নীতি অনুসারে একত্ববাদকে ইলহামী এবং শিরককে অবনতির একটি পর্যায় বলে ধরে নিতে হয়। ধর্ম বিশ্লেষকদের মতে মানুষের ভীতি ও বিস্ময় খোদার অবধারণার জন্ম দিয়েছে এবং শিরক থেকে ক্রমোন্নতির ধারা একত্ববাদের চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছেছে। আপাত দৃষ্টিতে তাদের এমন নীতির মধ্যে এই মতবিরোধ সামান্য বলেই মনে হয়। কিন্তু এই মতবিরোধের ক্ষেত্রে ধর্ম দাবি করে, খোদা তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর ধর্মবিশ্লেষকদের দাবি, মানুষ খোদাকে সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ খোদা তা'লার অবধারণা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসুত আর তা পূর্ণতা পেয়েছে মানুষের তৈরী দর্শনের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে।

এই আয়াত থেকে প্রশ্ন ওঠে, ইব্রাহিম কি শিরক করতে পারতেন? এর উত্তর যদি 'না' হয়, তবে তিনি 'খোদা আমাকে শিরক থেকে রক্ষা কর'-এই দোয়া কেন করলেন? এর উত্তর হল, মানুষের শক্তিবৃত্তি দুই প্রকারের। এক, যা সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন, সেগুলির বিষয়ে সে কখনও দোয়া করে না। যেমন- এই দোয়া করে না যে হে খোদা! আমার যেন একটিই মাথা থাকে, দুটি না হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার শক্তি সেগুলি যা মানুষ উপার্জন করে বা উপহার হিসেবে লাভ করে। অর্থাৎ সেগুলি তারা নিজেরাই উন্নতি করে অর্জন করে। অথবা অন্যদের থেকে বিশিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপা তাকে দান করে। এমন শক্তিসমূহের ক্ষেত্রে যেহেতু পতনের আশঙ্কা থাকে, তাই সেগুলির জন্য দোয়া অব্যাহত রাখতে হয়; যদিও আল্লাহ্ তা'লার এমন প্রতিশ্রুতিও থাকে যে তিনি তাকে সেই পুরস্কারে কল্যাণমণ্ডিত রাখবেন। কেননা এই দোয়ায় বস্তুত এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি থাকে যে 'এই নেয়ামত আমার নিজস্ব নয়, খোদা তা'লার কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে তা লাভ করেছি। ' এই নীতি প্রেক্ষিতে আম্বিয়াগণও নবুয়তের পুরস্কারের বিষয়েও দোয়ায় রত থাকেন। যেমন হযরত ইব্রাহিম এর এই দোয়া কিম্বা রসুল করীম (সা.)-এর দোয়া- রাব্বি যিদনি ইলমা বা ইসতেগফার ও তওবার সঙ্গে আম্বিয়াগণের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই তত্ত্ব না বোঝার কারণে অনেকেই আম্বিয়া (আ.)-এর ইসতেগফার ও তওবা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তারা মনে করেছে, নবীরা হয়তো পাপী ছিলেন। যদিও তাদের ইসতেগফার ও তওবার অর্থ, যে পবিত্রতার মর্যদায় তাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন, তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার স্বরূপ। সেই কৃপা ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তারা দোয়া করেন। কেননা এই ধারা আল্লাহ তা'লার কৃপাতেই বজায় থাকে।

এই কারণেই কুরআন করীমে বার বার *'ওয়া আলাল্লাহি ফাল ইয়াতাইয়াক্কুল মুতাইয়েক্কেলুন'* বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পরম উৎকর্ষ লাভের পরও মানুষকে খোদার আশ্রয়ে আসা উচিত। কেননা সেই উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হয়েছে খোদা তা'লার সহায়তা নিয়েই। এই সহায়তা লাভের স্বীকারোক্তি করতে থাকা নিজের জন্য এবং অন্যান্য সকলের জন্য হিদায়াতের কারণ হয়।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৩)

ওয়াকফে আরযী

১৯৬৬ সনের ১৮ মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযী তাহরীকের ঘোষণা দেন এবং বলেন, "সময়ের সাথে সাথে অনেক জামা'তে অলসতা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের যে সংখ্যায় মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম দরকার তা নেই। " এ কারণে তিনি (রাহে.) জামা'তকে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনায় ওয়াকফ করতে বলেন। এ সময়ে যাতায়াত ও খাবার খরচ নিজে বহন করবে এবং এ দিনগুলি ইবাদত, দোয়া এবং জামা'তের তরবিয়ত ও সেবায় অতিবাহিত করবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "জামা'তের সেসব সদস্য যাদেরকে আল্লাহ্ সুযোগ দিয়েছেন তাদের জন্য তাহরীক করছি, তারা যেন বছরে দুই থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য ধর্মের সেবায় ওয়াকফ করে। জামা'তের ব্যবস্থাপনায় ওয়াকফকৃত সময়ে তাদেরকে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানে তারা নিজেদের খরচে যাবে ও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করবে। আর যে কাজ তাদের অর্পন করা হবে তা করতে তারা সচেষ্ট থাকবে। " (আল ফযল, ২৩ মার্চ-১৯৬৬)

তিনি (রাহে.) আরো বলেন, "ওয়াকফে আরযী তাহরীকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বন্ধুগণ নিজ খরচে সদিচ্ছায় বিভিন্ন জামা'তে যাবেন এবং সেখানে কুরআন শিখানো ও পড়ানোর ব্যবস্থাপনাকে আরো সংগঠিত ও উন্নত করবেন।

সাংগঠনিকভাবে সেখানে জামা'তের তরবিয়ত যেন এরূপ হয় যার ফলে তারা কুরআনের আদেশ নিষেধকে স্বানন্দে বাস্তবায়ন করবে ও গোটা পৃথিবীর জন্য আদর্শ হবে। "(আল ফযল, ১৪ মে-১৯৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে ওয়াকফে আরযীর মাধ্যমে কুরআনের জ্যোতির বিকাশ ও এ তাহরীকের সফলতার সুসংবাদ দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ সনের ৫ আগস্টের খুতবায় বলেন, "একদিন আমার ঘুম ভাঙলে নিজেকে দোয়ায় মগ্ন পেলাম, জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখলাম যেভাবে বিদ্যুৎ চমকায় এবং পৃথিবী একাংশ থেকে আরেকাংশকে আলোকিত করে তোলে তদ্রূপ এক জ্যোতি প্রকাশিত হল এবং তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। এরপর দেখলাম এ জ্যোতি একটি অংশে একীভূত হচ্ছে। অতঃপর এটি বাক্যের রূপ ধারণ করল।সুতরাং আমাদের খোদা যিনি অতীব আশীষ বর্ষণকারী ও দয়াবান তিনি নিজেই আমাকে এর তাবীর বুঝিয়ে দেন। গত সোমবার আমি যোহরের নামায পড়ছিলাম এবং তৃতীয় রাকাতের রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম তখন মনে হল এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমি যে জ্যোতি দেখেছিলাম তা কুরআনের জ্যোতি, যা তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এ পরিকল্পনায় কল্যাণ দিবেন। কুরআনের জ্যোতি ঠিক সেভাবেই সারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে যেভাবে আমি সেই জ্যোতিকে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করতে দেখেছিলাম। " (খুতবাতে নাসের, প্রথম খণ্ড, ৩৪৪ পৃ.)

ওয়াকফে আরযী কারা করবে? হুযূর (রাহে.) জামা'তের প্রত্যেক শ্রেণীর পেশাজীবীদের এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে বলেন। তিনি বলেন কমপক্ষে ১৫ দিন খোদার জন্য জাগতিক কাজ থেকে ছুটি নিন অথবা প্রাপ্য ছুটি এ কাজে ব্যয় করুন। তিনি (রাহে.) বছরে পাঁচ হাজার ওয়াকফে আরযীর তাহরীক করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষক, প্রফেসর, ছাত্র, সরকারী চাকুরিজীবী এবং আইনজীবীদের বিশেষভাবে এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে বলেন। এছাড়া মহিলাদেরও স্থানীয়ভাবে ওয়াকফে আরযী করতে বলেন। মহিলাদেরকে তাদের স্বামী, পিতা ও ভাইদের সাথে অন্য জামা'তেও ওয়াকফে আরযী করার অনুমতি দিয়েছেন।

জামা'তের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওয়াকফে আরযী তিনি (রাহে.) বলেন, "জানতে পারলাম জামা'তের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ধারণা হল, তাদের ওয়াকফে আরযী তাহরীকে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এদের সবাইকে ছুটি নিয়ে ওয়াকফে আরযী করে পূণ্য অর্জন করা উচিত। " (আল ফযল, ৫ এপ্রিল-১৯৬৭)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ১৭ বছর খেলাফতকালে প্রায় চল্লিশ হাজার আহমদী ওয়াকফে আরযী করেন। এ তাহরীকের মূল উদ্দেশ্য হল, কুরআনের জ্যোতি দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলা। তাই হুযূর (রাহে.) তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর জন্য পৃথক বিভাগ গঠন করেন এবং জামা'তের তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযীর সেক্রেটারীকে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেন। *(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)*

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir